বিভিন্ন দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায়
বিজয়ীদের রচনা

রচনা সংকলন

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

রচনা প্রতিযোগিতার সংকলন

প্রকাশকালঃ ডিসেম্বর ২০২১

সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি:
মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী
মহাপরিচালক

সম্পাদকমন্ডলী:
এ.জে.এম. সালাহ্উদ্দিন নাগরী
উপপরিচালক
মাসুদুর রহমান
কিউরেটর
শাফিয়া তাসনীম দ্রাঘিমা
গ্যালারি সহকারী
রবিন বসাক
আর্টিস্ট
আফরোজা খাতুন
সহকারী লাইব্রেরিয়ান কাম-ক্যাটালগার

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা:
রবিন বসাক
আর্টিস্ট

অঙ্গসজ্জা/মুদ্রণালয়:
লাবিবা প্রিন্ট লিংক
৬৯, ইসলাম ভবন,
ফকিরাপুল (৩য় তলা)
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
মোবা: ০১৯১৩১৩৬১৭৬, ০১৮৩১৬৭৮১৮৪

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

যোগাযোগের ঠিকানা:
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর,
ঢাকা-১২০৭, ফোন: ০২-৫৮১৬০৬০৯
ই-মেইল: infonmst@gmail.com
Website: www.nmst.gov.bd

রচনা প্রতিযোগিতার সংকলন

সূচিপত্র

- আমার প্রিয় শেখ রাসেল - মোঃ মাহিন রানা (১ম স্থান অধিকারী) ০১
- আমার প্রিয় শেখ রাসেল - সাচিত শুভ্র বাড়ই (২য় স্থান অধিকারী) ০৩
- আমার প্রিয় শেখ রাসেল - মোহাম্মদ রায়হান উদ্দিন (৩য় স্থান অধিকারী) ০৫
- আমার প্রিয় শেখ রাসেল - নওরীন আদিয়াত (১ম স্থান অধিকারী) ০৮
- আমার প্রিয় শেখ রাসেল - অরুণিমা দাস (২য় স্থান অধিকারী) ১০
- আমার প্রিয় শেখ রাসেল - হাফসা আক্তার (৩য় স্থান অধিকারী) ১২
- সততা ও শুদ্ধাচার সমাজ গড়ার অঙ্গীকার - দেবশ্রুতি চৌধুরী নদী (১ম স্থান অধিকারী) ১৪
- সততা ও শুদ্ধাচার সমাজ গড়ার অঙ্গীকার - আসওয়াদ আহম্মেদ জিম (২য় স্থান অধিকারী) ১৬
- সততা ও শুদ্ধাচার সমাজ গড়ার অঙ্গীকার - জোবায়ের জামান (৩য় স্থান অধিকারী) ১৮
- দেশপ্রেমের চেতনা, বঙ্গবন্ধু আমার প্রেরণা - শৈহাইনু মার্মা (১ম স্থান অধিকারী) ২০
- দেশপ্রেমের চেতনা, বঙ্গবন্ধু আমার প্রেরণা - মোঃ সাইফুল ইসলাম (২য় স্থান অধিকারী) ২২
- দেশপ্রেমের চেতনা, বঙ্গবন্ধু আমার প্রেরণা - সাব্বির আহমেদ দিগন্ত (৩য় স্থান অধিকারী) ২৪
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বাংলাদেশ পৌঁছাবে অনন্য উচ্চতায় - মোঃ মাহিন রানা (১ম স্থান অধিকারী) ২৫
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বাংলাদেশ পৌঁছাবে অনন্য উচ্চতায় - সাদমান সামি (২য় স্থান অধিকারী) ২৯
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বাংলাদেশ পৌঁছাবে অনন্য উচ্চতায় - মোঃ সাইফুল ইসলাম (৩য় স্থান অধিকারী) ৩১

মহাপরিচালকের বাণী

জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় নিবেদিত অনন্য এক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর। শিশু-কিশোর ও তরুণ প্রজন্মের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শাণিত করতে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর নিয়মিত বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা, রচনা, চিত্রাঙ্কন, কুইজ এবং মেধাভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়ায়, বাংলাদেশ পৌঁছাবে অনন্য উচ্চতায়; সততা ও শুদ্ধাচার, সমাজ গড়ার অঙ্গীকার; দেশেপ্রেমের চেতনা, বঙ্গবন্ধু আমার প্রেরণা; আমার প্রিয় শেখ রাসেল; প্রভৃতি নির্বাচন করা হয়। এসব প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের মধ্যে সৃজনশীলতা ও বিজ্ঞান চর্চার আকর্ষণ বাড়ছে এবং তাঁদের বিজ্ঞানী ও গবেষক হবার স্বপ্নপূরণের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। করোনা সংকটে সৃষ্ট স্থবিরতায় এসব অনুষ্ঠানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয়ায় শিশু কিশোরদের মানসিক প্রফুল্লতা বেড়েছে এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তাঁদের মেধার প্রতিফলন ঘটেছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমান্তরালে বিজ্ঞান জাদুঘরের এ প্রয়াস তরুণ প্রজন্মের শিক্ষা জীবনে অন্তহীন জ্ঞান-চর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এ প্রকাশনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণা যোগাবে এ প্রত্যাশা নিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

মোঃ মাহিন রানা
দ্বাদশ শ্রেণি
নটরডেম কলেজ, ঢাকা

"আমার প্রিয় শেখ রাসেল"

অবতরণিকা :

বাঙালি জাতির রক্তস্নাত ইতিহাস থেকে যুগে যুগে আত্মপ্রকাশ করেছেন অসংখ্য মহান ব্যক্তিত্ব। পঞ্চাশ বছরেরও পূর্বে বাঙালি জাতির মধ্যে আবির্ভাব ঘটেছিল এমনই এক ক্ষণজন্মা, প্রতিভাবান, দুরন্ত শিশুর। তিনি আর কেউ নন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেল। মাত্র এগারো বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে তিনি নিজের জীবনকে প্রতিষ্ঠা করেছেন আদর্শ-অনুসরণীয় হিসেবে। এজন্য শেখ রাসেল আমাদের প্রিয়। তাইতো কবি বলেন,

"অবুঝ শিশুর সবুজ চোখে
স্বপ্ন আঁকার ;
যে শিশুটি তারা হয়ে আকাশ গায়ে জ্বলে
সে শিশুটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ছেলে।"
- শাহনাজ সুলতানা

প্রিয় শেখ রাসেলের জন্মকথা :

ভরা হেমন্তের আনন্দে ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর রাসেল জন্মগ্রহণ করেন। সমগ্র বাড়ি জুড়ে সেদিন ছিল আনন্দের জোয়ার। বিখ্যাত নোবেল বিজয়ী, দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী, আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের নেতা বার্ট্রান্ড রাসেলের নামানুসারে বঙ্গবন্ধু তাঁর নাম রাখেন রাসেল। ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাসায় জন্ম নেয়া শিশুটি হয়ে ওঠে সমগ্র জাতির কাছে আদরের ও স্বপ্নের সন্তান।

শেখ রাসেলের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও নির্মম হত্যাকান্ড :

শেখ রাসেলের জন্মের সময় দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত অস্থিতিশীল। জন্মের পর থেকেই বাবাকে কাছে পায়নি ছোট এই শিশুটি। বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতারের ফলে রীতিমতো বাবার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয় রাসেল। বঙ্গবন্ধু স্বয়ং "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" গ্রন্থে এই বেদনা প্রকাশ করেছেন। তাই বেশিরভাগ সময়ই রাসেল কাটিয়েছেন মা-বোনদের কাছে। ছোটবেলা থেকেই রাসেল ছিল উদার, সাহসী ও দুরন্ত। ইতিহাসের মহাশিশু হিসেবে একবুক স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন দুর্বার গতিতে। কিন্তু পিশাচদের বুলেটের থাবায় অসময়েই ঝরে যায় একটি প্রাণ, থমকে যায় এক বুক স্বপ্ন। ইতিহাসে ইতোপূর্বেও হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটেছে কিন্তু এরূপ বর্বরোচিত, পৈশাচিক, নির্মম হত্যাকান্ড ঘটেনি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। রক্ষা পায়নি ১১ বছরের নিরীহ শিশুটিও। ঘাতকের ব্রাশফায়ারে ঝরে পড়ে রাসেলের প্রাণ। হৃদয় কতটা বর্বর হলে একটা শিশুকে এভাবে হত্যা করা যায়! এভাবেই আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে যায় রাসেল, তবে রয়ে যায় তাঁর স্মৃতি ও আদর্শ।

■ শেখ রাসেল : অনুসরণীয় আদর্শ ও আমাদের ভালোবাসা :

ছোট শেখ রাসেলের মানবতাবোধ, নেতৃত্ববোধ আচরণ, পরোপকারী মনোভাবগুলো এক কথায় অতুলনীয়। বাচ্চাদের জড়ো করা, তাদের জন্য খেলনা বন্দুক বানিয়ে প্যারেড নেতৃত্ব দেয়া-তাঁর নেতৃত্বসুলভ আচরণেরই বহি:প্রকাশ। আর্মি অফিসার হয়ে দেশের সেবা করা তাঁর দেশপ্রেমকেই নির্দেশ করে। ভাই-বোনের সম্পর্কের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন রাসেল ও তাঁর হাসু আপা। রাসেলের কথা, কাজ ও প্রতিটি আচরণই প্রমাণ করতো তাঁর মন-মগজ আর শরীরের প্রতিটি শিরায়-উপশিরায় বহমান ছিল বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্ব, মানবতাবোধ আর ভিন্নতা। রাসেলের স্বভাব ছিল অত্যন্ত দুরন্ত প্রকৃতির। তাঁর শৈশবের গাঁথাগুলি যেন শাশ্বত দুরন্তপনার প্রতীক। ফুলের মতো শিশুটির অন্তরালে উঁকি দেয় এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। 'আমাদের ছোট রাসেল সোনা' বইটিতেই তাঁর এসব দিক জানা যায়। তাই রাসেল নিজের ছোট্ট জীবনকে গড়ে তুলেছে অনুসরণীয় হিসেবে। আমরা সবাই তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে পারব বহুদূর; কেননা তাঁর আদর্শ মানেই পরোক্ষভাবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ। এজন্যই রাসেল আমাদের এক ভালোবাসার নাম।

■ একনজরে শেখ রাসেলের জীবনবৃত্তান্ত :

রাসেলের জীবন পরিচয়

নাম	শেখ রাসেল	**জন্ম**	১৮ অক্টোবর, ১৯৬৪
মৃত্যু	১৫ আগস্ট, ১৯৭৫	**কারণ**	হত্যা
জাতীয়তা	বাংলাদেশি	**নাগরিকত্ব**	বাংলাদেশি
মাতৃ-শিক্ষায়তন	ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ	**পরিচিতির কারণ**	শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠপুত্র
আদি নিবাস	গোপালগঞ্জ	**মাতা**	বেগম ফজিলাতুন্নেসা
স্মৃতিচিহ্ন	শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র	**বই**	আমাদের ছোট রাসেল সোনা

তথ্যসূত্র : www.wikipedia.org

■ উপসংহার :

শেখ রাসেল বাঙালি জাতির কাছে এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। বাঙালি জাতি তাঁর মধ্যে খুঁজে পায় রূপকথার মতো নিজেদের ছেলেবেলাকে, বেঁচে থাকে বাঙালি জাতির আপামর শৈশব। অন্যদিকে তাঁর নির্মম মৃত্যুকাহিনী মনে করিয়ে দেয় আমাদের দেশের করুণ ইতিহাসের কথা। তাই রাসেলের চোখে আমাদের স্বপ্ন দেখতে হবে, গড়তে হবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা। বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় অঙ্গীকার।

"এই বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি,
নবজাতকের প্রতি
এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।"
- সুকান্ত ভট্টাচার্য্য

এ জন্যই রাসেলের আদর্শ ছড়িয়ে দিতে হবে সর্বত্র।

সাচিত শুভ্র বাড়ই
৯ম শ্রেণি
ফরিদপুর জিলা স্কুল
ফরিদপুর।

“আমার প্রিয় শেখ রাসেল”

■ ভূমিকা :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমন বাঙালি জাতির গর্ব ও অহংকারের প্রতীক তেমনি শেখ রাসেল ও আমাদের গর্ব ও অহংকারের প্রতীক। শেখ বঙ্গবন্ধু বংশের শুধু প্রদীপ নয়, সে ছিল বাঙালি জাতির প্রদীপ এবং এই বাংলার একটি নক্ষত্র ছিল। আমাদের দেশে বাঙালি জাতির প্রধান নেতা বললেই যে মানুষটির নাম সর্বপ্রথম মাথায় আসে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭৫ সেনা অভ্যুত্থানে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর নির্মম ও করুণ পরিণতির কথা আমরা সকলেই জানি। স্বাধীনতা দিবসে স্মরণ করি তার বীর পুত্র শেখ কামাল এবং শেখ জামালকে। তবে প্রায়শই যাকে আমরা ভুলে যাই তিনি হলেন ওই একই পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য, বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল। মাত্র ১১ বছর বয়সে নির্মম মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া রাসেল হয়তো তার কর্মের দ্বারা বাঙালি জাতির ইতিহাস ও উত্থানে দাগ কেটে রেখে যেতে পারেনি।

■ জন্ম :

তখন হেমন্তকাল, সময়টা ১৮ অক্টোবর ১৯৬৪। নবান্নের নতুন ফসলের উৎসবে আগমন নতুন অতিথির। এ যেন বাঙালির আনন্দ, বাংলার আনন্দ। ধানমন্ডি সেই ঐতিহাসিক ও ভয়ানক ৩২ নম্বর রোডের বাসায় ‘শেখ হাসিনার’ রুমেই রাত দেড়টার সময় রাসেলের জন্ম হয়। রাসেলের আগমনে পুরো বাড়ি জুড়ে বয়ে যায় আনন্দের জোয়ার। একটু বড়োসড়ো হয়েছিল শিশু রাসেল। জন্মের কিছুক্ষণ পর পরিবারের সবাইকে রাসেলের কথা জানানো হয়। পরে বোন শেখ হাসিনা এসে তার ওড়না দিয়ে ভেজা মাথা পরিষ্কার করে দেন।

■ নামকরণ :

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন বিখ্যাত নোবেল জয়ী দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের ভক্ত। তাঁর অনেক বই তিনি পড়েছেন। বার্ট্রান্ড রাসেল কেবল একজন দার্শনিকই ছিলেন না বিজ্ঞানীও ছিলেন। বার্ট্রান্ড রাসেল ছিলেন পারমাণবিক যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনের এক বড় মাপের বিশ্ব নেতাও। বিশ্ব শান্তি রক্ষার জন্য বার্ট্রান্ড রাসেল গঠন করেছিলেন-‘কমিটি অব হান্ড্রেড।’ রাসেলের জন্মের দু’বছরের পূর্বেই ১৯৬২ সালে কিউবাকে কেন্দ্র করে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কেনেডি এবং সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী ক্রুশেফ এর মধ্যে স্নায়ু ও কুটনৈতিক যুদ্ধ চলছিল। যেটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই বিশ্ব মানবতার প্রতীক হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল। আর তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্গবন্ধু তার কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রাখেন রাসেল।

■ প্রাথমিক জীবন :

শেখ রাসেল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা অঞ্চলের ধানমন্ডিতে ৩২ নম্বর ভবনে ১৮ অক্টোবর ১৯৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে রাসেল সর্বকনিষ্ঠ। ভাই-বোনের মধ্যে অন্য এক জন হলেন বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর অন্যতম সংগঠক শেখ কামাল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা শেখ জামাল এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতিবিদ শেখ

শেখ রাসেল কেন আমার প্রিয় :

বঙ্গবন্ধুর বাসায় একটি পোষা কুকুর ছিল 'টমি' নামে। টমির সবার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব ছিল। ছোট রাসেলও টমিকে নিয়ে খেলতো। একদিন খেলতে খেলতে হঠাৎ টমি ঘেউ ঘেউ করে কেঁদে ওঠে। তখন রাসেল ভয় পেয়ে যায়। কাঁদতে কাঁদতে রেহানার কাছে এসে বলে টমি আমাকে বকা দিয়েছে। তার কথা শুনে বাসার সবাইতো হেসেই আত্মহারা। টমি আবার কিভাবে বকা দিল। কিন্তু রাসেল বিষয়টা খুব গভীরভাবে নিয়েছিল। টমি তাকে বকা দিয়েছে এটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না, কারণ টমিকে সে খুব ভালোবাসতো। হাতে করে খাবার দিত। নিজের পছন্দ মতো খাবার গুলো টমিকে ভাগ করে দেবেই, কাজেই সেই টমি বকা দিলে রাসেল দু:খ তো পাবেই। এরই মধ্যে জন্ম হয় হাসিনার পুত্র জয়ের। রাসেল জয়কে পেয়ে মহাখুশি। সারাটা সময় জুড়েই জয়ের সাথে মিশে থাকতো রাসেল। এরই মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু রাসেল তাঁর নিজেকে নিয়ে চিন্তা নেই, তাঁর সমস্ত চিন্তা জয়কে নিয়ে। কারণ তাদের বাসার ছাদে বাংকারের মেশিন বসানো ছিল। ফলে দিনরাত গোলাগুলিতে প্রচন্ড আওয়াজ হতো আর তাতে শিশু জয় বার বার কেঁপে কেঁপে উঠতো। আর এ ব্যাপারে রাসেল খুবই সচেতন ছিল। যখনই সাইরেণ বাজত বা আকাশে মেঘের মতো আওয়াজ হতো, রাসেল তুলো নিয়ে এসে জয়ের কানে গুজে দিতো। সব সময় পকেটে তুলা রাখত। রাসেলের মাছ ধরার খুব শখ ছিল, কিন্তু সে মাছ ধরে আবার তা পুকুরে ছেড়ে দিত। এতেই সে মজা পেত। সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে, তার সকল প্রাণী তথা যার মনের ভাব মানুষ বুঝতে পারা বা না পারা এমন প্রাণীর প্রতি অফুরন্ত ভালোবাসাই তাঁকে করেছে আমাদের সকলের প্রিয়।

হত্যাকান্ড :

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট প্রত্যুষে একদল তরুণ সেনা কর্মকর্তা ট্যাঙ্ক দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বাসভবন ঘিরে ফেলে। শেখ মুজিব, তাঁর পরিবার এবং তাঁর ব্যক্তিগত কর্মচারীদের সাথে শেখ রাসেলকেও হত্যা করে। শেখ মুজিবের নির্দেশে রাসেলকে নিয়ে পালানোর সময় ব্যক্তিগত কর্মচারীসহ রাসেলকে অভ্যুত্থানকারীরা আটক করে। আতঙ্কিত হয়ে শিশু রাসেল কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেছিলেন, "আমি মায়ের কাছে যাব, পরবর্তীতে মায়ের লাশ দেখার পর অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে মিনতি করেছিলেন, আমাকে হাসু আপার (শেখ হাসিনা) কাছে পাঠিয়ে দাও। ব্যক্তিগত কর্মচারী এএফএম মহিতুল ইসলামের ভাষ্যমতে "রাসেল দৌড়েঁ এসে আমাকে জাপটে ধরে। আমাকে বললো, ভাইয়া আমাকে মারবে না তো? ওর সে কণ্ঠ শুনে আমার চোখ ফেটে পানি এসেছিল। এক ঘাতক এসে আমাকে রাইফেলের বাট দিয়ে ভীষণ মারলো। আমাকে মারতে দেখে রাসেল আমাকে ছেড়ে দিল। ও (শেখ রাসেল) কান্নাকাটি করছিল যে, আমি মায়ের কাছে যাব। এক ঘাতক এসে ওকে বললো, চল তোর মায়ের কাছে দিয়ে আসি। বিশ্বাস করতে পারিনি যে ঘাতকরা এতো নির্মমভাবে ছোট্ট সে শিশুটাকেও হত্যা করবে। রাসেলকে ভিতরে নিয়ে গেল এবং তারপর ব্রাশ ফায়ার।

উপসংহার :

রাসেল তাঁর বাবাকে কাছে পাবার সুযোগ খুব কমই পেয়েছে, তাই বাবাকে যখনই কাছে পেতে সারাক্ষণ তার পাশে ঘোরাঘুরি করতো। খেলার ফাঁকে-ফাঁকে বাবাকে এক পলকের জন্য হলেও দেখে আসতো। রাসেলের যদি শিশু বয়সে মৃত্যু না হতো তাহলে বঙ্গবন্ধুর মতো বাঙালি জাতির পিতা হিসেবে রাসেল স্থান পেত। সুতরাং রাসেলের বাল্য জীবন থেকে এই শিক্ষাই পেতে পারি যে, সে আমাদের ছিল প্রকৃত বন্ধু এবং বাঙালি জাতির মহানায়ক।

মোহাম্মদ রায়হান উদ্দিন
আলিম ২য় বর্ষ
দারুন্নাজাত সিদ্দিকীয়া কামিল মাদ্রাসা
ডেমরা, ঢাকা।

"আমার প্রিয় শেখ রাসেল"

মুহা. রায়হান উদ্দিন

- **প্রিয়। একটা শব্দ।**

এ শব্দটাকে চিরতরে আবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র "শেখ রাসেল"এর সাথে। যিনি বাঙালি জাতির কাছে এক যুগোত্তীর্ণ ব্যক্তিত্ব। বাঙালি জাতি তাঁর মাঝে খুঁজে পায় রূপকথার মতো নিজেদের ছেলেবেলাকে। তাঁর মধ্যে বেঁচে থাকবে আপামর বাঙালির শৈশব।

- **১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর।**

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক বাড়িতে মুজিব ফজিলাতুন্নেছার ঘর আলোকিত করে শিশু রাসেল জন্মগ্রহণ করে।

বঙ্গবন্ধুর প্রিয় লেখক বার্ট্রান্ড রাসেল। পৃথিবীর বিখ্যাত দার্শনিক ও সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী। তাঁকে কেন্দ্র করে তিনি এ নাম রাখেন।

জানা যায়, ১৯৭৫ সালে শেখ রাসেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েল ল্যাবরেটরী স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ছিল। সে মাত্র ১০ বছর ১০ মাস বেঁচে ছিলেন।

মাঝে মধ্যে যখন শেখ রাসেল টুঙ্গিপাড়ায় বেড়াতে যেত। ছোট্ট বন্ধুদের জড়ো করে খেলনার কাঠের বন্দুক বানাতো। তারপর সেই বন্দুক দিয়ে তাদের প্যারেড করাতো। তাদের জন্য ঢাকা থেকে জামা কাপড় কিনে নিতো। প্যারেড শেষে সকলের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতো।

তাঁকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করতো, "তুমি বড় হয়ে কী হবে?" সে বলতো, "আমি বড় হয়ে আর্মি অফিসার হবো"।

দুই বছর বয়সের কথা

বড়বোন শেখ হাসিনার সঙ্গে শেখ রাসেল একবার কারাগারে বাবাকে দেখতে যাবে। সে বোনকে জিজ্ঞেস করলো, আমি কি তাঁকে (বঙ্গবন্ধুকে) বাবা বলে ডাকতে পারবো?
- হ্যাঁ, পারবে।
পিতার সান্নিধ্য স্নেহ-মমতায় বড় হয়ে উঠার তেমন সুযোগ হয়নি। একমাত্র মা-ই ছিলেন তাঁর সব আদর-আবদার, ভালোবাসা- ও মমতার আঁধার। আর সেই ভাই-বোনদের ছিল একেবারে চোখের মনি।

কখনো কখনো পিতার একান্ত সান্নিধ্যে তাঁর সময় কাটতো। বাবা বাসায় ঢুকে সর্বপ্রথম তাঁকে খুঁজতেন। ভরা কণ্ঠে হাঁক দিতেন তার নাম ধরে, এভাবে-
রাসেল, তুমি কোথায়? এখানে চলে এসো!

তিন চাকার সাইকেল ছেড়ে তড়িঘড়ি করে দৌঁড়ে এসে চড়ে বসতো বাবার কোলে। বাবার চশমাটা দারুণ লাগতো তাঁর। পিতার পুত্রের কথা বলার ভঙ্গীগুলো ছিল বেশ চমৎকার। বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকার আঞ্চলিক ভাষা ও উর্দু মিশিয়ে একটা নিজস্ব ভাষা গড়ে উঠতো তাঁদের। সে সব ভাষায় রাসেল যখন কথা বলতো, বাবা তখন হেসে উঠতো। তিনিও চেষ্টা করতেন জগাখিচুড়ি ভাষায় জবাব দিতে।

বড় ভাই-বোনেরা পালা করে তাঁকে স্কুলে আনা-নেওয়া করতো। বাসায় ছিল ছোট একটা লাইব্রেরি। আলমারি ভর্তি বাবার সংগৃহীত বইপত্র। মাঝে মধ্যে বোনেরা তাঁকে গল্প পড়ে শোনাতো। একই গল্প ক'দিন পর পর শোনানো হলে দু'এক লাইন মাঝখানে বাদ পড়লে সে ঠিক ধরে ফেলতো আর বলতো ঐ লাইনগুলো বাদ দিয়েছ কেন?

তাঁর প্রিয় খাবার ছিল চকলেট, সমুচা ও কেক। তবে পোলাও ও ডিম পোচ এমনকি ঢেড়স চিনি দিয়ে মিশিয়ে খেতো। চলাফেরায় বেশ সাবধানী ও সাহসী ছিল কোন কিছুতে তেমন ভয় করতো না। কালো পিঁপড়া দেখলে সে ধরতে যেত। একবার একটা বড় পিঁপড়া আঙ্গুলে কামড় দিয়ে বসলো। যন্ত্রণায় আঙ্গুলটি ফুলে উঠে। এরপর থেকে ওই পিঁপড়া আর ধরে না। পরবর্তী সে তার নাম দেয় "ভুট্টো"।

বড় বোন হাসু আপা শেখ রাসেলের কথা ও কান্না টেপ রেকর্ডারে রেকর্ড করে রাখতেন। সে যদি কোন কারণে কান্নাকাটি করতো, তখন বোনেরা টেপ ছেড়ে দিতেন। থেমে যেত রাসেলের কান্না। চুপ হয়ে ঝিম ধরে বসে থাকতো। টেপে তাঁর কান্না বাজলে অনেক সময় মা দৌড়ে আসতেন কান্না থামাতো। ফলে তাঁরা দেখতেন আর হাসতেন।

পোশাক পরিধানে সে ছিল খুব সচেতন। বাবার মতো প্রিন্স কোর্ট, সাদা পাজামা, পাঞ্জাবি ও মুজিব কোর্ট পড়তো। মাছ ধরার বেশ শখ ছিল। টুঙ্গিপাড়ায় গেলে পুকুরে মাছ ধরতো। গণভবনেও মাছগুলোকে খাবার খাওয়াতো।

বাসায় কবুতরের ঘর ছিল। অনেক কবুতর থাকতো। মা খুব ভোরে উঠে কোলে নিয়ে কবুতরের খাবার দিতেন। হাটতে শেখার পর নিজেই কবুতরের পিছনে ছুটতো সারাদিন। খাবার দিত, আদর করতো, কিন্তু কবুতরের মাংস খেত না। এগুলোর প্রতি ছিল তাঁর খুব দয়ামায়া।

শেখ রাসেলদের বাসায় 'টমি' নামে একটি কুকুর ছিল। রাসেল এর সাথে নিয়মিত খেলা করতো। একদিন খেলার সময় কুকুরটি কান্নাকাটি শুরু করলো। রাসেল বুঝতে পারলো যে, কুকুরটির খুব ক্ষুধা পেয়েছে। তাই সে ঘর থেকে খাবার এনে দিলে কুকুরটি খেয়ে খুব খুশি হলো। তাঁর স্বভাব ছিল অত্যন্ত দুরন্ত প্রকৃতির। আর এই দুরন্তপনার সঙ্গী ছিল একটি বাই সাইকেল। রাষ্ট্রীয় প্রটোকল ভেঙ্গে সেই বাইসাইকেলকে সঙ্গী করে সে রোজ স্কুলে চলে যেতো।

১৯৭২ সাল। শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা মার্কেটে নতুন সিনথেটিক শাড়ি কিনতে যায়। সাথে ছোট্ট শেখ রাসেলও ছিল। সে বায়না ধরে তাঁর শিক্ষিকার জন্যও শাড়ি কিনতে হবে। কথামতো আরেকটি শাড়ি কেনা হলো। বাসায় ফিরলে তাঁর শিক্ষিকার শাড়িটি বোনদের শাড়ি থেকে সুন্দর হয়নি বলে অভিমান করে কান্নায় বুক ভাসিয়ে দেয়। শাড়ি পেয়ে শিক্ষিকা খুব খুশি হয়েছে বললে রাসেলের মন আনন্দে ভরে উঠে। সে শুধু নিজেই খাবে, নিজেই পরবে এটা ভালোবাসতো না। বরং অন্যরা খাবে পরবে এটা তাঁর প্রত্যাশা ছিল।

সে বঙ্গবন্ধুর সাথে একবার জাপানে গিয়েছিল। রাশিয়া-যুক্তরাজ্যও ভ্রমন করেছিল। বাড়ির প্রাঙ্গণ, সামনের রাস্তা এবং ফুফুদের বাসা-ই ছিল তাঁর বিচরণ ভূমি। একাত্তরের পর ইন্দিরাগান্ধী বাংলাদেশে বেড়াতে এলে মা-বাবার সঙ্গে বিমান বন্দরে ছোট্ট রাসেল তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিল।

পরিশেষে বলতে হয়, আমাদের প্রিয় রাসেল বিশ্বের অধিকারহারা, নির্যাতিত-নিপীড়িত শিশুদের প্রতীক ও প্রতিনিধি। ১৯৭৫'র ১৫ আগস্টের নিরপরাধ শিশু রাসেলকে হত্যা মানবসভ্যতার নিকৃষ্টতম এক অমানবিক হৃদয় বিদারক দৃশ্যপট। তাইতো প্রিয় রাসেল নিষ্পাপ, নির্মল, অধিকারহারা শিশুদের প্রতীক হয়ে বেঁচে থাকবে আমাদের মাঝে আজীবন।

তথ্যসূত্র

১। কারোগারের রোজনামচা, বঙ্গনবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
২। আমাদের ছোট রাসেল সোনা, শেখ হাসিনা।
৩। শেখ রাসেল : একটি ফুলের মতো শিশু, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ইন্টারনেট।
৪। আদরের রাসেল, প্রাগুক্ত।
৫। দৈনিক বাংলাদেশে প্রতিদিন-২০২০-২০২১।
৬। দৈনিক কালেরকন্ঠ-২০১৮-২০২১
৭। দৈনিক প্রথম আলো-২০১৯-২০২১
৮। দৈনিক যুগান্তর-২০১৯-২০২১

নওরীন আদিয়াত
৪র্থ শ্রেণি
এসওএস হারম্যান মেইনার কলেজ
বগুড়া সদর, বগুড়া।

“আমার প্রিয় শেখ রাসেল”

“আমার প্রিয় শেখ রাসেল ” হচ্ছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা দম্পতির সর্বকনিষ্ঠ সন্তান, বড় আদরের প্রশ্রয় পাওয়া দুরন্ত বালক। বিশ্বখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের খুব ভক্ত ছিলেন বঙ্গবন্ধু। বার্ট্রান্ড রাসেলের দর্শনশাস্ত্রের বই পড়ে বঙ্গমাতাকে বাংলায় ব্যাখ্যা করে শোনাতেন। বঙ্গমাতা রাসেলের দর্শনশাস্ত্রের এত ভক্ত হয়ে যান যে, নিজের সর্বকনিষ্ঠ সন্তানের নাম রাখেন “রাসেল”।

শেখ রাসেলের প্রকৃত নাম শেখ রিসাল উদ্দিন। ডাকনাম রাসেল, বঙ্গবন্ধুর ৫ সন্তানের মধ্যে রাসেলের জন্ম ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর ধানমন্ডির ৩২নং নিজবাড়িতে, তার বড় বোন বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শোয়ার ঘরে।

হাঁটতে শেখার পর থেকেই রাসেল কবুতরের পিছনে ছুটত, নিজ হাতে ওদের খাবার দিত কিন্তু কবুতরের মাংস খেত না। তবে রাসেল চকলেট, সমুচা ও কেক খুব পছন্দ করতো। প্রায় সব খাবারে চিনি মিশিয়ে খেতে পছন্দ করতো।

রাসেল বঙ্গবন্ধুকে ছায়ার মত অনুসরণ করতো। আব্বাকে মোটেই ছাড়তে চাইতো না। বঙ্গমাতা ওর জন্য প্রিন্স স্যুট বানিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ বঙ্গবন্ধু প্রিন্স স্যুট যেদিন পরতেন, রাসেলও পরতো, কাপড় চোপড়ের ব্যাপারে ছোটবেলা থেকেই তাঁর নিজের পছন্দ ছিল। বালক বয়সেই রাসেলের মধ্যে আলাদা ব্যক্তিত্বের প্রকাশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। নিজের পছন্দের উপর খুবই বিশ্বস্ত ছিল। খুবই স্বাধীন মত নিয়ে চলতে চাইতো। ছোট মানুষটার চরিত্রের দৃঢ়তা দেখে অবাক হতে হয়। রাসেলের স্বপ্নীল চোখ দুটি ছিলো মায়া ভরা। যে কেউ তাঁকে দেখতো, আদর করে কোলে তুলে নিতো।

রাসেলের একটা ছোট ‘মপেট’ মোটর সাইকেল আর একটা সাইকেলও ছিল। তিন চাকার সাইকেলও ছিল। তিন চাকার সাইকেল নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকতো।

শেখ রাসেলের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর সকল গুণেরই পূর্বাভাস পরিলক্ষিত হয়েছিলো। পিতা বঙ্গবন্ধুর মতই ছিল রাসেলের উদার হৃদয়, ছিল মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা। বঙ্গবন্ধু যেমন জামা-কাপড় অন্যকে দিয়ে দিতেন টুঙ্গিপাড়া গেলে একই কাজ করতো রাসেল। খেলার সাথীদের জামা-কাপড় দিতো রাসেল। ছেলের এমন প্রবণতার কথা বুঝতে পেরে টুঙ্গিপাড়া যাবার সময় বঙ্গমাতাও বেশী করে জামা কাপড় কিনে নিয়ে যেতেন, যাতে ছেলে ইচ্ছেমতো তা বন্ধুদের দিতে পারে।

বঙ্গবন্ধু রাসেলকে খুব আদর করতেন। বাইরে থেকে ঘরে ফিরেই প্রথমে রাসেলকে খুজতেন। কোলে বসিয়ে কত কথা বলতেন। রাসেলও কত কথা বাবাকে জিজ্ঞেস করতো।

চার বছর বয়সে রাসেল ঢাকা ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলে শিশু শ্রেণিতে ভর্তি হয়। প্রতিবেশী ইমরান ও আদিল ছিল ওর বন্ধু। তাদের সাথে সে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলতো। তবে ফুফাতো ভাই আরিফ ছিল সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মাছ ধরতে রাসেল খুব পছন্দ করতো।

রাসেল ওর বাবার মত মানুষকে আপ্যায়ন করতে খুবই পছন্দ করতো।

টুঙ্গিপাড়া গ্রামের বাড়িতে গেলে বাচ্চাদের জড়ো করে ডামি বন্দুক দিয়ে প্যারেড করতো। রাসেলের নাসের কাকা এক টাকা নোটের বান্ডিল দিতেন। খুদে বাহিনীকে বিস্কুট লজেন্স কিনে খেতে টাকা দিতো। প্যারেড শেষ হলে তাদের হাতে টাকা দিতো।

রাসেলের ইচ্ছা ছিল আর্মি অফিসার হওয়ার। শেখ রাসেল অধিকার হারা এবং নির্যাতিত, নিপীড়িত শিশুদের প্রতীক ও প্রতিনিধি।

বিশ্ব শিশু দিবসের মাস অক্টোবরে রাসেলের জন্ম এবং জন্মক্ষণের শুভদিন। তাঁর জন্মদিন আনন্দের হলেও তাঁকে হারানোর বেদনার ছবিই আমাদের আবেগে আপ্লুত করো।

শেখ রাসেল আজ আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু আছে তাঁর স্মৃতি। শেখ রাসেল আজ একটি চেতনার নাম, এই চেতনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, এই চেতনা অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের চেতনা। রাসেল কোটি শিশুর চেতনার বাতিঘর। এই বাতিঘরের আলো দেখে আমাদের শিশুরা এগিয়ে যাক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে, সাথী হোক রাসেলের বড় বোন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অদম্য উন্নয়নে অবদান রাখতে।

শোক হোক শক্তি, যেমনটি কবি বলেছেন-
সবচেয়ে যে শেষে এসেছিল
সেই গিয়েছে, সবার আগে সরে।
ছোট্ট যে জন ছিল রে সবচেয়ে,
সেই গিয়েছে সকল শূন্য করে।'

(ছিন্নমুকুল : সতেন্দ্রনাথ দত্ত)

অরুণিমা দাস
৪র্থ শ্রেণি
জুনিয়র
বিদ্যাময়ী সরকারি
বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
ময়মনসিংহ।

"আমার প্রিয় শেখ রাসেল"

"রাসেল আছে চিত্র হয়ে
থাকবে চিরদিন।
ঘরের শত্রু বিভীষণের
থাকবে কাঁধে ঋণ।"
অমর রাসেল, সুকুমার বড়ুয়া।

আমাদের এই রূপসী বাংলার ঘরে ঘরে জন্ম নেওয়া অগণিত শিশুর মতোই প্রাণবন্ত এক শিশু শেখ রাসেল। স্কুলের খাতার নাম শেখ রিসাল উদ্দিন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু যখন ব্যস্ত সময় পার করেছেন ঠিক তখনই ধানমন্ডির ৩২ নম্বর আলো করে সে এসেছিল। মাত্র দশ বছরে তার সম্ভাবনাময় জীবন শেষ হয়ে যায় একদল বিশ্বাসঘাতকের বুলেটে। তবে বাঙালির হৃদয়ে চির অম্লান আমার প্রিয় শেখ রাসেল।

■ **জন্ম :**
শেখ রাসেলের জন্ম ১৮ অক্টোবর ১৯৬৪। ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের ১০০ নম্বর বাড়িতে। পিতা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব। পাঁচ ভাই-বোনের মাঝে রাসেল ছিল কনিষ্ঠ। জন্মের সময় বঙ্গবন্ধু নির্বাচনী মিটিং এ চট্টগ্রামে ছিলেন। বঙ্গবন্ধু বিখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের বড় ভক্ত ছিলেন। তাঁরই নাম অনুসারে ছোট ছেলের নাম রাখেন শেখ রাসেল।

■ **বেড়ে উঠা :**
রাসেলের বেড়ে উঠা ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে। বাড়ির সামনের বাগানে ভাই বোনদের সাথে হাঁটতে শেখা। রাসেল ছিল চটপটে আর দুরন্ত। বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকার আঞ্চলিক ভাষা ও উর্দু মিশিয়ে নিজস্ব একটা ভাষায় কথা বলতো।

অল্প বয়সেই রাসেলের মেধার পরিচয় পেয়ে যায় সবাই। বড় বোন শেখ রেহানা এ প্রসঙ্গে লিখেছেন।

"আমাদের বাসায় ছোটদের অনেক গল্পের বই ছিল। একই গল্প পরদিন শোনাতে বসলে দু'এক লাইন বাদ পড়তো। রাসেল ঠিকই ধরে ফেলতো এবং বলতো কালকের সেই লাইনটা আজ পড়লে না কেন?"

প্রতিবেশী ইমরান ও আদিল ছিল তার খেলার সাথী। তাদের সাথে ক্রিকেট আর ফুটবল খেলত। এছাড়া বেগম মুজিব একটি তিন চাকার সাইকেল কিনে দিয়েছিলেন। সেই সাইকেল নিয়ে সারাদিন ঘুরে বেড়াত। গ্রামের বাড়ি টুঙ্গিপাড়াতেও খেলাধুলার অনেক সাথী ছিল। ঢাকা থেকেই রাসেল তাদের জন্য জামা কাপড় কিনে নিয়ে যেত। রাসেলের প্রিয় খাবার ছিল চকলেট, সমুচা, কেক আর চিনি দেওয়া ডিম পোচ।

■ শিক্ষা জীবন :

রাসেল স্কুলে যেতে শুরু করে চার বছর বয়সে। ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলে শিশু শ্রেণিতে ভর্তি হয়। তার গৃহশিক্ষিকা ছিলেন গীতালি দাশগুপ্তা। রাসেলকে পড়ানোর অভিজ্ঞতা তিনি তুলে ধরেছেন এভাবে-
"শেখ রাসেলকে একবার যেটা শিখিয়েছি, তা সে কোনদিন ভুলে নাই।"

■ মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস :

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এরপর পাকিস্তানী সেনারা বঙ্গমাতাসহ পরিবারের সবাইকে তৎকালীন ধানমন্ডির ১৮ নম্বর সড়কের একটি বাড়িতে বন্দি করে রাখে। ছোট্ট রাসেলেরও বন্দি জীবন শুরু হয়। যুদ্ধের নয় মাস রাসেলের জন্য ছিল কষ্টের। ঠিকমতো খাবার নেই, খেলনা নেই, বইপত্র নেই। বন্দিখানায় বাবার কোন খবর পাওয়া যায় না। বড় ভাই শেখ কামাল আর শেখ জামালও তখন যুদ্ধে। তবে ভাগ্নে জয়ের জন্মের পর রাসেলের মুখের হাসি কিছুটা হলেও ফিরে আসে। সারাদিন ওকে নিয়েই থাকত। আক্রমণের সময় সাইরেন বাজলে জয়ের কানে তুলা গুঁজে দিত।

■ স্বাধীনতার পর :

১০ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে এলে রাসেল বাবাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করত। বঙ্গবন্ধুও যেখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব রাসেলকে নিয়ে যেতেন। রাষ্ট্রীয় সফরে রাসেল বঙ্গবন্ধুর সাথে জাপান, মস্কো ও লন্ডন বেড়াতে যায়।

■ ভয়াল কালো রাত :

বঙ্গবন্ধুর গতিশীল নেতৃত্বে যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছিল তখন সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী সদস্যের হাতে ১৫ আগষ্ট, ১৯৭৫ জাতির পিতা সপরিবারে শহিদ হন। ঘাতকরা সেদিন ১০ বছরের ছোট্ট শিশুটিকেও ছেড়ে দেয়নি। পরিবারের সবার লাশের সামনে দিয়ে হাঁটিয়ে সবার শেষে তারা নৃশংসভাবে হত্যা করে রাসেলকে।

■ আমাদের প্রিয় শেখ রাসেল :

ঘাতকের নিষ্ঠুর বুলেট সেদিন রাসেলের প্রাণ কেঁড়ে নিলেও তারা তাঁকে আমাদের মন থেকে মুছে দিতে পারেনি। বাঙালি জাতি যতদিন থাকবে শেখ রাসেল বেঁচে থাকবে প্রতিটি বাঙালির অন্তরে। প্রিয় রাসেলকে খুঁজে পাই ছড়াকার আনজীর লিটন এর "রাসেল আবার ফিরত যদি" নামক ছড়ায়,

"আয় রে রাসেল ফিরে আয়
পালতোলা সেই নৌকায়
নৌকা বুকে ছুটতে নদী
রাসেল আবার ফিরত যদি...."

■ **উপসংহার :**

রাসেলের মৃত্যুতে সেদিন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল সারা বিশ্ব। প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল মানবাধিকার, মানুষের মনুষত্ব। তবে একথাও সত্য যে, কিছু বুলেট আমাদের স্মৃতি থেকে রাসেলকে মুছে দিতে পারেনি। শেখ রাসেল বিরাজমান বাংলার আকাশে বাতাসে, শিশুর হাসিতে, মানুষের হৃদয়ে, স্নেহ আর ভালোবাসায়। জাতির পিতা সোনার বাংলায় প্রতিটি প্রান্তরে রাসেল অনন্তকাল বেঁচে থাকবে আমাদের ভালোবাসা হয়ে। কবি ফারুক নওয়াজ এর ভাষায়-

"রাসেল সোনা চাঁদের কণা কে বলেছে রাসেল নেই
রাসেল আছে হৃদয়জুড়ে জাতির পিতার বাংলাতেই"

হাফসা আক্তার
জুনিয়র
চর হোগলাবুনিয়া মমিন স্মৃতি
মাধ্যমিক বিদ্যালয়
ময়মনসিংহ।

"আমার প্রিয় শেখ রাসেল"

■ **ভূমিকা :**

হৃদয়কে পাথর করে বুকের গহীনে বহন করা বেদনাকে সংহত করে দু:খের নিবিড় অতলে ডুব দিয়ে তুলে আনি বিন্দু বিন্দু মুক্তো দানার মতো অভিজ্ঞতার সকল নির্যাস। সেই এক একটি মুক্তো দানার অন্তরালে লুকিয়ে আছে সেই ছোট্ট রাসেলের ১১ বছরের ক্ষুদ্র জীবদ্দশার ছোট ছোট স্মৃতি। সেই স্মৃতি বলে এক অসমাপ্ত স্বপ্নের গল্প, বলে হাসু আপার সেই ছোট্ট ভাইয়ের গল্প, বলে বাঙালি জাতিসত্তার বুকে জুড়ে থাকা এক ভালোবাসার গল্প, বলে শেখ রাসেলের গল্প। তাই প্রিয় শেখ রাসেলের উৎসবের জন্মদিন বাঙালি জাতির মস্তিষ্কে আনাগোনা ঘটায় সেই ছোট্ট ছোট্ট সুখময় স্মৃতির। তাঁর নামখানা ছিল বাঙালি জাতির হৃদয় নিংড়ানো এক অনুভূতির নাম। তাঁর এই জন্মদিনে তাঁর স্মৃতির কথা হৃদয়ে দোলা দেয়। বুকের মধ্যে ভেসে ওঠে বেদনার এক মহাকাব্য। তাই কোটি বাঙালির কণ্ঠে বেঁজে উঠে ঃ

"আজকের পৃথিবী তোমার জন্য
ভরে থাকা ভালো লাগা
মুখরিত হবে দিন গানে গানে
আগামীর সম্ভাবনা।

শেখ রাসেলের জন্মের মাহেন্দ্রক্ষণ ও নামকরণ :

সালটা তখন ১৯৬৪ আর অক্টোবরের ১৭টি দিন পেরিয়ে ১৮ তম দিন। ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে শেখ মুজিবুর রহমানের নিবাস। সেখানেই শেখ পরিবারে আগমন ঘটে নতুন অতিথির। আগমন ঘটে সম্ভাবনাময় এক আলোকবর্তিকার। জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান আর বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের কোলে নেমে আসে এক স্বর্গ। সেই স্বর্গের নাম শেখ রাসেল। মাথা ভরা কালো চুল আর তুলতুলে নরম গাল। এই অতিথির নামটিও রাখেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর প্রিয় লেখক ছিলেন বার্ট্রান্ড রাসেল। তাঁর নামের সাথে মিলিয়ে শেখ পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে অভ্যুদয় ঘটল শেখ রাসেলের। এই নামটিকে ঘিরেই হয়তো মহৎ কোনো স্বপ্নের এক অসীম আকাঙ্ক্ষা আমাদের জাতির পিতার অন্তরাত্মাকে তৃপ্ত করেছিল। শেখ রাসেল যদি আজ পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকতেন তবে হয়তো এই নাম গোটা বিশ্বমন্ডলে আলোড়ন তুলতো। হয়ে উঠত সম্ভাবনার এক নতুন বার্তা।

শৈশবের পদচারণা :

শিশু রাসেলের পদচারণার বেশির ভাগ সময়ই তাঁর পথচলার সঙ্গী হতে পারেননি তাঁর বাবা। কারণ তাঁর বাবা দেশের স্বাধীনতার স্বপ্নের বাস্তব রূপ দিতে রাজনৈতিক বন্দী হয়ে কারাগারের অন্ধকার কুঠুরিতে লোহার গরাদের পেছনে কাটিয়েছে জীবনের সিংহভাগ সময়। বাবাকে কাছে না পাওয়ার এক অসীম আর্তনাদ সবসময়ই শিশু রাসেলের অন্তরাত্মাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খেতো। রাসেল ছিলেন সাধারণের মাঝে অসাধারণ। ছিলেন দুরন্ত এক বালক। তাঁর ছোঁটাছুটিতে মেতে থাকত ৩২ নম্বর। তাঁর এই দুরন্তপনার সঙ্গী ছিল সাইকেল। বিকেলে সূর্য ঢলে পড়লেই সাইকেলের পিঠে চেপে তিনি বের হতেন লেকের পাড়ে চক্কর কাটতে। তাঁর মন মগজ আর প্রতিটি শিরা উপশিরায় বহমান ছিল তাঁর পিতার ব্যক্তিত আর মানবতাবোধ। ভীষণ রোদ্দুর হয়ে এসেছিলেন রাসেল। তাঁর চোখের দ্যুতিতেই দারুন এক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। তাঁর বিদ্যাপিঠ ছিল ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজ। পড়তেন চতুর্থ শ্রেণিতে। আর পাঁচটা ছেলের মতোই জীবনকে সাধারণভাবে নিয়েছিলেন রাসেল। তাঁর বিদ্যালয়ে যাতায়াতের যানবাহনে ছিল সাইকেল। সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দিয়েই সে ছুটে যেতো বিদ্যালয়ের পানে। তাঁর খেলার দলবল ছিল তাঁর সৈন্য-সামন্ত। তাদের নিয়ে করতেন প্যারেড। স্বপ্ন ছিল একজন আর্মি-অফিসার হওয়া। বেঁচে থাকলে হয়তো তিনি হতেন আজকের অগ্রপথিক, হতেন উন্নয়নের কান্ডারী, হতেন অগ্র সেনানী।

একটি অসমাপ্ত স্বপ্নের অপমৃত্যু :

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট। বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে খসে পড়লো তাঁর হৃদপিন্ড। ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ি প্রচন্ড গোলাগুলি আর আর্তচিৎকারে এক ধ্বংস্তুপে পরিণত হলো। আমরা হারালাম জাতির পিতাকে, চিরতরে হারিয়ে ফেললাম বঙ্গমাতাকে, হারালাম তাঁর পরিবারকে, হারালাম শেখ রাসেলকে। জীবনের শেষ কয়েক মিনিট সমাপ্ত হবার আগে সে যেতে চেয়েছিল তাঁর মায়ের কাছে, যেতে চেয়েছিল তাঁর হাসু আপার কাছে কিন্তু তার বদলে সে পেল বুলেটের ব্রাশফায়ার। সাত সমুদ্র তেরো নদী দূরে থাকা হাসু আপার অগোচরেই তাঁর ছোট্ট ভাই রাসেলের জীবনঘড়ির কাটাগুলো থেমে যায়। সে আর তাঁর সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দেবে না। আর বন্ধুদের নিয়ে তাঁর প্যারেড করা হবে না। আর হওয়া হবে না আর্মি অফিসার। ঘাতকের নির্মম বুলেট তাঁর সকল স্বপ্নের সমীকরণ এলোমেলো করে দেয়। তাই, আজ মনে পড়ছে কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা ঃ

তুই তো গল্পের বই, খেলনা নিয়ে
সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন বয়সেতে ছিলি
তবুও পৃথিবী আজ এমন পিশাচি হলো
শিশুরক্ত পানে তার গ্লানি নেই।

■ **উপসংহার :**

রাসেল ছিলেন এক উজ্জ্বল দ্যুতি। তাঁর ছিল স্বপ্ন। ছিলো চরম নেতৃত্ববোধ। তিনি ছিলেন এক আলোকময় শিশুর প্রতীকী, ছিলেন দুর্বার। তবুও পৃথিবীর অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরের মধ্যে তাঁকেও পড়ে যেতে হয়েছিল কিছু অকাল কুষ্মান্ডের জন্য। তারা জানে না মানুষ মরলেও মানুষের আদর্শ হয় অমর। তাই শেখ রাসেলের আদর্শ ছিল, আছে ও থাকবে প্রতিটি শিশুর অন্তরে। সেই আদর্শ আমরা হৃদয়ে ধারণ করবো, গড়বো স্বপ্নের সোনার বাংলা। মেলাবো রাসেলের স্বপ্নের সমীকরণ। তাই বলতে চাই ঃ

তুমি দেখিয়েছো আলোর ভোর
তুমিই খুলেছো নতুন দোর
তোমার আদর্শ প্রাণেতে আমার
আমরা আনবো রেঁনেসে আবার।

দেবশ্রুতি চৌধুরী নদী
১০ম শ্রেণি
সরকারি এস.সি. বালিকা
উচ্চ বিদ্যালয়
সুনামগঞ্জ।

"সততা ও শুদ্ধাচার সমাজ গড়ার অঙ্গীকার"

■ **সূচনা :**

"এমন একটি শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ এর প্রতিষ্ঠা হবে, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে। (জাতীয় সংবিধান, বাংলাদেশ)"

বর্তমানে একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো তার মধ্যে অন্যতম হলো দুর্নীতিমুক্ত, সুষ্ঠু সমাজ গড়া। আর সততা ও শুদ্ধাচারপূর্ণ জনগনের দ্বারাই সুষ্ঠু সমাজ তথা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গঠন সম্ভব।

■ **সমাজ গঠনে সততা ও শুদ্ধাচার :**

সততা ও নৈতিকতা দ্বারা প্রভাবিত হয় আচরণ।
উৎকর্ষই শুদ্ধাচার। অর্থাৎ সমাজের প্রতিটি সৎ ব্যক্তিই শুদ্ধাচারী। যখনই সমাজে সততা, নৈতিকতার অবক্ষয় হয় তখনই অপরাধমূলক কাজ ও দুর্নীতির পরিমাণ বেড়ে এক শ্রেণির মানুষ শাসন ও শোষণ করে নির্যাতনের দাপটতা দেখায়। আর আরেক শ্রেণির মানুষ শোষিত, নিপীড়িত হয়ে দরিদ্রসীমারও নিচে বসবাস করে। কিন্তু একজন সৎ, নির্লোভ, শুদ্ধাচারী ও প্রতিবাদী সর্বদাই সমাজের কল্যাণ করে, সমাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা করে। একটি সমাজের রাজনীতি, মনোভাব, সংস্কৃতি তথা ব্যক্তিবর্গই সমাজের পরিস্থিতি বলে দেয়। নৈতিক আদর্শ সংবলিত কোনো সমাজে ঘুষ, দুর্নীতি, প্রতারণা, স্বার্থপরতা, গুম, ধর্ষণ, প্রভৃতি অনাচার থাকবে না। বর্তমানে বাংলাদেশের সমাজ ঘুষ-দুর্নীতির ঘৃণা থেকে সরে এসে দিনদিন এসবের প্রতি সহনশীল হচ্ছে। ঘুষ-দুর্নীতির এসব টাকা বিদেশে পাচার করেও অনেকে দেশপ্রেমিক সেজে বসে আছে।

যদি আজ সামাজিক শিক্ষা আমাদের প্রতিবাদী হতে শেখাতো তবে আজ বেকারত্বের কিংবা দুর্নীতির হার বাড়তো না। যদি যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও টাকার বিনিময়ে সরকারী চাকুরির বিরুদ্ধে কেউ রুখে দাঁড়াতো, তবে আজ বাংলাদেশও একটি উন্নত দেশে পরিণত হতো। প্রতিবেশী দেশ ভারতের থেকে সকল দিক দিয়ে এগিয়ে থেকেও দুর্নীতির জন্য আমরা আজ পিছিয়ে। যেখানে সততা আছে, সেখানেই সুষ্ঠু ন্যায় বিচারেরও নিশ্চয়তা আছে। একজন সৎ ব্যক্তিই সকলের আদর্শ হলে সকলেই আজ শুদ্ধাচারী হতো, যা দেখে ভবিষ্যৎ প্রজন্মও শিক্ষা গ্রহণ করতো। বর্তমানে বিশ্বে শীর্ষ ১৮০টি দুর্নীতিগ্রস্থ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১২তম। সবচেয়ে কম দুর্নীতির দেশ হলো যথাক্রমে ডেনমার্ক ও নিউজিল্যান্ড। একটু খেয়াল করলেই দেখা যায়, নিউজিল্যান্ড একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ। অর্থাৎ তারা দেশ গঠনে সমাজ এর উপর জোর দিচ্ছে। কয়েকটি পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক, আচরণিক, নৈতিক সকল শিক্ষার সমন্বয়ে আজকের সমাজ। ২০০১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ দুর্নীতির শীর্ষে ছিল। গত দশ বছরে সরকার যেভাবে সমাজ সংস্করণে ভূমিকা রেখেছে, মাঠ পর্যায় থেকে যেভাবে প্রতিটি স্থানে আবশ্যকীয় প্রতিটি জিনিসের ব্যবস্থা করেছে তার ফল আজকের এই বাংলাদেশ। বিশ্বের প্রতিটি দেশে আইনের কঠোর প্রয়োগ তথা সুষ্ঠু ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণ, প্রাপ্য মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিতকরণ করা হবে। আজকের পদ্মা সেতুও সততার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একজন সৎ ও নির্লোভ ব্যক্তিই যে একটা জাতিকে রক্ষা করতে পারে বঙ্গবন্ধুর কর্মকান্ড তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কবিগুরু বলেছিলেন, "দন্ডিতের সাথে দন্ডদাতা কাঁদে ঘরে শ্রেষ্ঠ সে বিচার"। কবিগুরুর সেই কথার মর্মার্থ তখনই প্রকাশ পাবে যখন একজন সৎ ব্যক্তি সেই দন্ডদাতা হবেন। একজন সৎ ব্যক্তির কাছে অপরাধী নয় অপরাধ ঘৃণ্যকর। তাই তো সে সমাজ সংস্কারক। তাই একটি সুষ্ঠু সমাজ গঠনে সততা এবং শুদ্ধাচার এর ভূমিকা অপরিসীম।

উপসংহার :

> "ছোট ছোট বালুকণা, বিন্দু বিন্দু জল
> গড়ে তোলে মহাদেশ, সাগর অতল।"

হ্যাঁ, পরিবার থেকে, সমাজ থেকেই দেশ তথা স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠন সম্ভব। সততা ও শুদ্ধাচারের মাধ্যমে যেমন দুর্নীতি নিরোধ করা সম্ভব ঠিক তেমনি আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে ন্যায়বিচারও নিশ্চিত করা যায়।

নাম: আসওয়াদ আহম্মেদ জিম
১০ম শ্রেণি
কুষ্টিয়া জিলা স্কুল
পূর্ব মজমপুর, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া

“সততা ও শুদ্ধাচার সমাজ গড়ার অঙ্গীকার”

ভূমিকা :

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে সত্য ও মিথ্যার লড়াই হয়েছে প্রতিনিয়ত। সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় এর মধ্যে দ্বন্দ হয়েছে, তবে সকল ক্ষেত্রে জয় হয়েছে সত্য ও ন্যায় এর। সমাজের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সত্যের ও মিথ্যার লড়াই চলে। কখনো কখনো হয়তো সত্যের আলো একটু দেরিতে প্রকাশ পায় তবে সত্যের জয় ও মিথ্যার পরাজয় এক চিরন্তন সত্য কথন। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

“তুমি জান ক্ষুদ্র যাহা ক্ষুদ্র তা নয়
সত্য যেথা কিছু আছে বিশ্ব সেথা রয়”

হ্যাঁ তিনি সঠিকই বলেছিলেন, সত্য চিরন্তন, সত্যই জীবন। তেমনই শুদ্ধাচার, সমাজকে করে সুন্দর।

সততা ও শুদ্ধাচারের সমাজ গঠনে অবদান :

চরিত্র মানব জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। চরিত্র মানব জীবনের মহিমা। মানুষের চরিত্র অনুযায়ী গড়ে ওঠে মানুষের ব্যক্তি জীবন। একটি আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজন মহৎ গুণাবলী ও মহৎ আদর্শের অনুসারী যাদের মধ্যে প্রকাশ পাবে সততা, শুদ্ধাচার, দায়িত্ববোধ, দেশপ্রেম, ইত্যাদি। সততা মানুষকে মুক্তির পথ দেখায়। সততা ও শুদ্ধাচার মানুষকে সৎ করে তোলে যার ফলে তারা কখনো ভোগ, বিলাসিতা, লোক ঠকানো ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হয় না। যার ফলে সমাজ হয়ে ওঠে সুন্দর। তেমনই শুদ্ধাচার মানুষকে অন্য মানুষের প্রতি নম্র আচরণ করতে সাহায্য করে। যার ফলে সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়। আমাদের মহানবী (সা:) বলেছেন “মজলুম কে সাহায্য কর, জালেম কেও সাহায্য কর”

এছাড়াও আমরা জানি, আচরণে, ভদ্রতা, শ্রদ্ধাবোধ, রুচিবোধ ও সততার মিলনের মাধ্যমে এক শিষ্টাচারপূর্ণ চরিত্র গঠিত হয়।

সততা ও শুদ্ধাচারের গুরুত্ব :

সমাজের উন্নতি বা অনবতি নির্ভর করে সেই সমাজের মানুষদের উপর। যে সমাজের মানুষদের মধ্যে নেই সততা, নেই শিষ্টাচার, নেই শ্রদ্ধাবোধ তাদেরকে দিয়ে আর যাই হোক সেই সমাজের উন্নতি সাধিত হবে না। এ সকল অধমদের সম্পর্কে বিদ্রোহী কবি বলেছেন,

“আমরা সবাই পাপী,
আপন পাপের বাটখারা
দিয়ে অন্যের পাপ মাপি”

তাই আমাদের সকলের উচিৎ অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। যার মাধ্যমে একটি সুন্দর সমাজ গঠন হবে। এই সততা, অন্যকে সাহায্য করা, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাচার নিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন,

"মানুষকে ভালোবাসলে মানুষও ভালোবাসে।
যদি সামান্য ত্যাগ স্বীকার করেন,
তবে জনসাধারণ আপনার জন্য জীবন দিতেও পারে"

তাই প্রত্যেকটি জায়গায় সততা, শুদ্ধাচার ও অন্যকে সহযোগিতার মনোভাব রাখতে হবে।

সমাজের সমস্যা সমাধানে সততা ও শিষ্টাচার এবং শ্রদ্ধাচার এর অবদান :

আমাদের সমাজে দুর্নীতি, চুরি, মারামারি, হত্যা, ডাকাতি, ইত্যাদি নানা রকমের সমস্যা রয়েছে। যা সমাজের উন্নতির প্রধান অন্তরায়। এ সকল সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হলো সততা ও শ্রদ্ধাচারের অনুশীলন। আজকে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ যখন সৎ, সত্যবাদী ও অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে তখন সমাজে কোন দুর্নীতি থাকবে না। তখন সমাজে কোন হানাহানি, হত্যা, ধর্ষণ এর মতো জঘন্য কাজ গুলো থাকবে না। তাই সমাজকে সুন্দর, অপরাধমুক্ত করতে হলে আমাদের সকলকে হতে হবে সত্যবাদী ও অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই 'টমাস কার্লাইল' বলেছিলেন- "নিজেকে একজন সৎ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলুন"। এছাড়াও "মেনেন্ডার" বলেন- "একজন সৎ লোকই অন্য এক জনকে সৎ হিসেবে গড়ে তোলে"।
তাই সমাজ গঠন ও সমাজের সমস্যা সমাধানে সততা ও শুদ্ধাচারের কোন বিকল্প নেই।

উপসংহার :

বর্তমান সমাজে অফিস আদালত থেকে শুরু করে বাজারের পান দোকানেও মিথ্যার ছড়াছড়ি। সামান্য দু-পয়সা লাভের জন্য মিথ্যা বলছে দোকানদার ব্যবসায়ী। ভোটের জন্য মিথ্যা বলছে রাজনীতিবিদগণ। মামলায় মক্কেল জেতাতে মিথ্যা বলছে উকিল, এভাবে সমাজকে ধ্বংস করে মিথ্যা। তাই সকল ক্ষেত্রে সকলের উচিৎ সততার পরিচয় দেয়া। যার মাধ্যমে আদর্শ সমাজ ও সোনার বাংলা গঠিত হবে। এজন্য মহানবী (সা:) বলেন, "মুস-লমান বলে নয়, মানুষ হিসেবে স্বস্তি ও প্রশান্তির জন্য আজকের অস্থির সময়ে সত্যবাদিতার যে ভীষণ প্রয়োজন।" তাই সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য সকলকে আদর্শ চরিত্র গঠন করতে হবে। যেখানে থাকবে সততা ও শ্রদ্ধাচার।

তাই পরিশেষে কবি গুরুর একটি কথা বলতে চাই, তা হলো-

"সত্য যেখানে সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায়
উৎসব তো সেখানেই"

জোবায়ের জামান
৯ম শ্রেণি
এস. এম. মডেল সরকারি
উচ্চ বিদ্যালয়
গোপালগঞ্জ।

"সততা ও শুদ্ধাচার সমাজ গড়ার অঙ্গীকার"

উপক্রমনিকা :

সততা ও শুদ্ধাচার সমাজ জীবনের বিকশিত শতদল। একজন মানুষের জীবনের সততা যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হিসেবে কাজ করে তেমনিভাবে জীবনের নানা বাঁকে জীবনকে সার্থকতা এনে দেয় শুদ্ধাচার। সততা ও শুদ্ধাচার ব্যক্তিগত গুণ হলেও সমাজের সাথে এর নিবিড় সম্পর্ক। যখন থেকে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে জীবন যাপন শুরু করলো, সমাজ গড়তে সামাজিক সম্পর্কের আবির্ভাব ঘটলো, তখন থেকেই সমাজের মানুষের ভেতর আবির্ভাব ঘটলো "সততা ও শুদ্ধাচার" নামক দুটি মানবীয় গুণের, আচরণে যার সার্থক বহিঃ প্রকাশ।

Oscar Wilde তাঁর 'The Importance of Being Earnest' নাটকে বলেছেন :

Courtesy and politeness are the basic principle which directs human life smoothly.

সততা, শুদ্ধাচার ও সমাজ জীবন :

সততা, শুদ্ধাচার- কথাটির মধ্যেই তাৎপর্য লুকায়িত। শুদ্ধ রুচিপূর্ণ ও ভদ্র ব্যবহারের বা আচার আচরণ যেমন ঃ শুদ্ধাচার তেমনি শুধুমাত্র "সততা" শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, স্পষ্টবাদিতা, সাধুতা, সারল্য ও সত্য পালন প্রভৃতি।

মানুষ যতদিন অরণ্যচারী ছিলো, ততদিন তার সততা ও শুদ্ধাচারিতার প্রয়োজন হয়নি। তবে মানুষ যখন বন্য, বর্বর, বিচ্ছিন্ন জীবনযাপনের পালা শেষ করে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন করতে আরম্ভ করলো তখন সমাজে বসবাসকারী লোকদের সংঙ্গে প্রীতি ও সখ্যতা বজায় রাখার তাগিদে মানুষের সততা ও শুদ্ধাচার নামক গৌরবজনক আচরণের প্রয়োজন হলো। এই দুটি গুণকে নির্বাসন দিয়ে মানব সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব নয়। উন্নত সমাজ ও সভ্যতা এরই অবদান পুষ্ট।

মানবজীবনে শিষ্টাচার, শুদ্ধাচার ও সততা :

দেহের সৌন্দর্য্য অলংকার
আত্মার সৌন্দর্য্য সততা ও শুদ্ধাচার

সততা ও শুদ্ধাচার মানুষের মনুষত্ব অর্জনের প্রধান সোপান। শিষ্টাচারের মাধ্যমে আর সততার দৃঢ়তায় মানবিক সত্ত্বার বিকাশ ঘটে বলে অসত্য ও ঔদ্ধত্য পরাজিত হয়। দূর হয় কদর্য, উচ্ছৃঙ্খলতা। তাই হয়তো লেখক বলেছিলেন,

The Greatest ornament of an
illustrious life is modesty,
humanity & honesty

■ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে সততা ও শুদ্ধাচার :

একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে একবার হিসেব নিকাশ করলে আমরা দেখতে পাবো, শুদ্ধাচার ও সততা আমাদের উপহার দিয়েছে সভ্যতা, ইতিহাস। কেবল এই গুণ দুইটির কারণেই আমরা নিজেদের সুসভ্য মানুষ বলে গর্ববোধ করতে পারি। মানুষ ও অন্যান্য জীবের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে মানুষ কতগুলো মহৎ মানবিক গুণাবলির অধিকারী যা পশুর মধ্যে নেই। এই গুণই সমাজকে এবং সমাজ জীবনকে করে সর্বাত্মক সুন্দর।

সততা ও শুদ্ধাচার মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদের ক্রমপুঞ্জিত যোগফল, মানুষের অন্তর সমুদ্র মননজাত দুর্লভ অমৃত ফল।

■ সততা শুদ্ধাচার এবং বিরাজমান বাস্তবতা :

আজ দিকে দিকে যখন সামাজিক অসাম্য। যখন ধনবানের উদ্ধত আচরণ, যখন বিচারের বাণী নিরবে নিভৃতে কাঁদে, যখন নির্লজ্জ অশালীন ব্যবহারে মানুষ কুণ্ঠিত নয়, তখন তা সমাজের এক অন্ত:সারশূন্যতারই করুণ চিত্র। আজ সমাজের নানা ক্ষেত্রেই অসততা ও অশুদ্ধাচারের করুণ চিত্র। দিন দিন বাড়ছে সীমাহীন ঔদ্ধত্য। বাংলাদেশের জীবন দর্শন, সামাজিক আচার আচরণের শ্বাশত মুল্যবোধ, বিচ্ছিন্নতার ভাবধারায় লুণ্ঠিত। প্রবলের সীমাহীন উদ্ধত্য আজ সততা ও শুদ্ধাচারের অসহায় প্রকাশ মাত্র। মূল্যবোধের অবক্ষয়ের এই ক্রান্তিলগ্নে সততা ও শিষ্টাচার আজ একান্ত দরকার। মানবতার এই আহবান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ-

"শুদ্ধাচার উন্নতির প্রধান সোপান
সততায় মানব হয় মহা মহীয়ান"

■ যবনিকা :

একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আজ দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সংসার চক্রের অনিবার্য ঘর্ষণে যে শ্বাসরোধকারী মরু রুক্ষতা উত্থিত হচ্ছে তা থেকে আজ যদি জাতিকে নতুন প্রাণসম্পদে অনুপ্রাণিত করতে হয়, যদি সমাজে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তবে নতুন করে প্রয়োজন ; সততা ও শুদ্ধাচার উদ্বোধন। সত্যের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন যীশুখ্রিষ্ট, শুদ্ধাচারী জোয়ান অফ আর্ক কে ডাইনী বলে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। সত্যকে সমুন্নত রাখতে জীবন দিতে হয়েছে দার্শনিক সক্রেটিসকে; একইভাবে সততা ও শুদ্ধাচার পুন: প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সার্থক হোক মানবসভ্যতা। সেই অসততা ও অশুদ্ধাচারের বিস্তার থেকে মুক্তি পেতে, জীবনকে ও সমাজকে শোভামন্ডিত করতে যথার্থ হোক এই স্লোগান :

"সমাজ গড়ার অঙ্গীকার
সততা ও শুদ্ধাচার"

শৈহাইনু মার্মা
দ্বাদশ শ্রেণি
রাজারবাগ পুলিশ
লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ

"দেশপ্রেমের চেতনা, বঙ্গবন্ধু আমার প্রেরণা"

আমি জন্মেছি বাংলায়, আমি বাংলায় কথা বলি....
যখন আমার জনকের নাম শেখ মুজিবুর রহমান ;
তাঁরই ইতিহাস প্রেরণায় আমি বাংলায় পথ চলি-
চোখে নীলাকাশ, বুকে বিশ্বাস, পায়ে উর্বর পলি।
-সৈয়দ শামসুল হক

একটা বয়স থাকে যখন সব কিছুতেই প্রবল আগ্রহ আর কৌতুহল কাজ করে। আমিও যথাযথ সময়ে এই বয়সটা পেরিয়ে এলেও পেছনে ফিরে তাকালে দেখতে পাই, কত ঘটনা আর কতশত জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত ঘিরে রয়েছে শেখ মুজিবকে নিয়ে। ছোটবেলা থেকেই তাঁকে নিয়ে লেখা গান, কবিতা ও গল্প পড়ে আমার বেড়ে ওঠা। তারপর কিভাবে যেন তাঁকে অনুকরণ করা শুরু করলাম। আর আস্তে আস্তে মনের অজান্তেই তিনি হয়ে উঠলেন আমার আদর্শ মানুষ।

দেশপ্রেম বঙ্গবন্ধুর সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ছিল। দেশপ্রেমকে তিনি তাঁর ভাবনা-চিন্তায়, স্বপ্ন ও চেতনা পরিপূর্ণভাবে ধারণ করে নিয়েছিলেন। তাই বঙ্গবন্ধুর কথা বলতে গেলে তাঁর গভীর দেশপ্রেমের কথা বলতেই হয়। দেশপ্রেমের সংজ্ঞা শুধু দেশের মাটিকে জড়িয়ে নয়, শুধু দেশের পতাকা কিংবা মানচিত্রকে জড়িয়ে নয়, মানুষের সার্বিক মঙ্গলের শুভ চিন্তা-ভাবনাই হলো সত্যিকারের দেশপ্রেম। বঙ্গবন্ধু তাই সারাজীবন দেশকে ভালোবাসতে গিয়ে দেশের মানুষকে ভালোবেসেছেন। সত্যিকারভাবে দেশপ্রেম কাকে বলে তা তাঁর জীবন থেকেই শিখতে হয় বারবার। "বঙ্গবন্ধু" যদি এই শব্দটিকে ব্যবচ্ছেদ করি তাহলে আমরা যা পাই, তা হলো বঙ্গ বা বাংলার বন্ধু, অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রাণের বন্ধু। যিনি না থাকলে 'বাংলাদেশ' নামক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্মই হতো না। 'বঙ্গবন্ধু' উচ্চারণ করলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে একজন বজ্রকঠিন মানবের। যিনি তাঁর শাণিত কণ্ঠ আর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব দিয়ে জয় করে নিয়েছিলেন লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়। "বাংলার মাটি আমার মাটি"- এই চিন্তা ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনের মৌলিক সত্যের দর্শন। বাঙালির ভাগ্যাকাশে যখন দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দিয়েছিল, তখনই আবির্ভাব ঘটেছিল এই মহান নেতার।

"Love isn't love till you give it away
love isn't love till it's free
the love in your heart
wasn't put there to stay
Oh love isn't love till you give it away"

বাংলার মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসা ছিল সীমাহীন। তিনি বাংলাদেশের জনগণকে নিজ সন্তানের মতোই ভালোবাসতেন হয়তো তার থেকেও বেশি। ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টের আপনার সবচেয়ে বড় যোগ্যতা কী? এ প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমি আমার দেশের মানুষকে ভালোবাসি'।

ডেভিড ফ্রস্টের 'আপনার বড় দুর্বলতা কী? এ প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, আমি আমার দেশের মানুষকে বেশি ভালোবাসি' এ কথার মাধ্যমে জনগণের প্রতি জাতির পিতার অকৃত্রিম ভালবাসা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের প্রতি বিশ্বাসের বিষয়টিও স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়। (সূত্র যুগান্তর, ১৬ ফেব্রুয়ারী -২০২০)।

আমি এমন একটা পরিবারে বড় হয়েছি, যেখানে বই পড়াটা ছিল নিয়মিত অভ্যাসের বিষয়। ফলে ছোটবেলা থেকেই আমি বই পড়তে ভীষণ ভালবাসি। শৈশব থেকে যেসব বইগুলো পড়তাম তার মধ্যে একটা বড় অংশই ছিল বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। বাল্যকাল ও কৈশোর থেকে সংগ্রাম করে বেড়ে উঠা বঙ্গবন্ধু সারাজীবন এটিই সাধনা করেছেন, আর তা হচ্ছে-বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা। তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' পাঠ করলেই বুঝতে পারি কি অসীম সাহসী, গভীর স্বদেশ প্রেমিক, সুনিশ্চিত লক্ষ্যভেদী এবং জনদরদী এক ভূমি পুত্রের জন্ম হয়েছিল এই অভাগা দেশে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন পুরো দেশের সব মানুষের ছেলেবেলা থেকেই স্কুলের শ্রেণিকক্ষে ও খেলার মাঠে তিনিই ছিলেন নেতা। মানুষের দু:খ-কষ্টে স্থির থাকতে পারতেন না কিশোর শেখ মুজিব। মানুষের বিপদে আপদে পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন সবসময়। তাঁর ছেলেবেলার এমনি ঘটনা সম্পর্কে অনেকেই বলেন- বাবা বাড়িতে না থাকলে পাড়ার গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন নিজেদের ঘরের ধান আর চাল। বর্ষাকালে ছাতাবিহীনবন্ধুকে দিয়ে দিতেন নিজের ছাতা। শীতকালে গায়ের চাদর পরিয়ে দিতেন বস্ত্রহীন বুড়ো বুড়ির মাঝে। শেরে বাংলার কাছ থেকে স্কুল ঠিক করার জন্য ১২০০ টাকা আদায় করে নেওয়া সেই মুজিব আজ আমাদের জাতির পিতা। শেখ মুজিব মানেই তো বাংলাদেশ, স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।

দেশপ্রেম আর দেশপ্রেমিকের সবচেয়ে বড় উদাহরণ ছিলেন শেখ মুজিব। খেলার মাঠ থেকে রাজনৈতিক মঞ্চ, তিনি কখনোই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা নত করেননি। যেখানে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে, তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। সেবার প্রয়োজন হয়েছে তো তিনি ছুটে গিয়েছেন। তাই শেখ মুজিব শুধু আমার নয়, সমগ্র বাংলাদেশের গর্ব ও প্রেরণার উৎস। তিনি ছিলেন স্বপ্নের চেয়েও বড় একজন মানুষ। তাই তো বলি-

"ব্যক্তি তুমি মুজিব তুমি
তুমিই জাতির পিতা
তোমার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে
আমরা হবো দেশের নেতা।"

মোঃ সাইফুল ইসলাম
১০ম শ্রেণি
বিওএফ হাই স্কুল
বিআইডিসি ডুয়েট
গাজীপুর।

"দেশপ্রেমের চেতনা, বঙ্গবন্ধু আমার প্রেরণা"

ভূমিকা :

"একটি বজ্রকণ্ঠ তর্জনীর একটি বজ্র নিনাদ
মিটিয়ে দিল পলাশীর পরাজয়ের অপবাদ
টুঙ্গিপাড়ার দামাল ছেলে জাতির বঙ্গবীর
দেশপ্রেমের চেতনার মূর্তপ্রতীক চির উন্নত শির"

দেশপ্রেমের চেতনা, যা হৃদয়ের অন্তরাল থেকে উদ্ভূত ভালোবাসার প্রেক্ষিতে দেশকে রক্ষা ও উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে মানুষকে দেদীপ্যমান করে। আর এতে যদি প্রেরণায় থাকে বঙ্গবন্ধু তবে চেতনায় দীপ্তমান মানুষ হাসিমুখে ত্যাগ করতে পারে জীবন।

বাঙালির প্রেরণায় বঙ্গবন্ধু :

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বর্বর পাকিস্তানিদের কাছ থেকে বাঙালি লাভ করে স্বাধীনতা। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জাতি হারায় ৩০ লক্ষ সূর্য সন্তান ও ৩ লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রম। কিন্তু এত ত্যাগের পরেও বাঙালির হার না মানার পেছনে যে কারণটি ছিল তা হলো বাঙালি ছিল একজন বঙ্গবন্ধু। কিউবার মহান বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো বলেন, *"I never see Himalayan but I see Bangabandhu"* আজও যখনি বাঙালি বিশ্ব ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখে তখনি তাদের প্রেরণায় ভেসে ওঠেন বঙ্গবন্ধু।

আমাদের অগ্রযাত্রায় দেশপ্রেমের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর প্রেরণা :

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বাঙালি রক্তের বিনিময়ে মাতৃভূমিকে ক্রয়ের পর তাদের প্রথম চেতনাই ছিল বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো। বঙ্গবন্ধুকে প্রেরণায় নিয়ে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছানো। সেই চেতনাকে বুকের কষ্টিপাথরে খোদাই করে বাঙালি উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছে বাঁধাহীন ভাবে।

দেশপ্রেমের চেতনায় বঙ্গবন্ধুকে প্রেরণায় নেওয়ার যে সাফল্য তা সার্থক রূপ লাভ করে বাঙালির সাফল্য দ্বারা। যে জাতি ছিল একদিন ঘুমন্ত, সে জাতি আজ অংশ নিচ্ছে বিশ্ব উন্মাদনায়।

স্বপ্ন যখন উঁকি দেয় আকাশ ছুঁতে তখনই বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসেবে বাঙালি মহাকাশে প্রেরণ করে “বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১”। রূপপুর পারমাণবিক প্ল্যান্ট” দৃশ্যমান করে বাঙালি বিশ্বকে আরেকবার তাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়াও স্বপ্নের “পদ্মা সেতু, বঙ্গবন্ধু টানেল, বাস্তবায়নও যেন বাঙালির মহাসাফল্য। অর্থাৎ বাঙালির সাফল্যের মূল ভিত্তিই হলো প্রেরণার বঙ্গবন্ধু ও দেশপ্রেমের চেতনা। দেশপ্রেমের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুকে প্রেরণায় তরুণরা :

“এক মুজিব ঘুমন্ত
লক্ষ মুজিব ঘরে
ওরা ভেবেছিল তোমাকে শেষ করলেই শেষ
কিন্তু ওরা জানতো না তুমি মানেই বাংলাদেশ”

আজ তরুণদের প্রেরণায় রয়েছে অগ্নিদীপ্ত বঙ্গবন্ধু। তরুণরা এর প্রমাণ দিচ্ছে পৃথিবী জয় করা কাজের দ্বারা। ২০১৮ সালে “গ্রিস অলিম্পিয়াডে” প্রথম হওয়া বাঙালি তরুণ জাওয়াদ যেন অনুপ্রেরণার বঙ্গবন্ধু। তরুণ যারা আগামীতে চালাবে বিশ্ব আজ তারা যেন তাদের কাজের দ্বারা ঘটাচ্ছে নব নব উত্থান। অর্থাৎ তারা বঙ্গবন্ধুকে প্রেরণায় নিয়ে দেশপ্রেমের চেতনায় জ্বলে উঠেছে নির্ভীকভাবে।

■ স্বর্ণাসন আরোহন :

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ মানুষ সর্বদাই চায় তার জাতিকে পৃথিবীর স্বর্ণনাসন আরোহন করাতে। আর এতে যদি বঙ্গবন্ধুকে নেওয়া হয় প্রেরণা তবে যোগ হয় নতুন মাত্রিকতা। বাঙালি যেন তারই সাক্ষীস্বরূপ। হৃদয়ের প্রেরণা বঙ্গবন্ধু এবং অন্তরে দেশপ্রেমের চেতনার সমন্বয় ঘটিয়ে বাঙালি পার করে একের পর এক বাঁধা। এমডিজি পূরণ করে আজ এসডিজি বাস্তবায়নের পথে। অনুন্নত দেশ থেকে আমরা আজ উন্নয়নশীল দেশ। অর্থাৎ স্বর্ণাসন আরোহন করতে আমরা আজ অনেকটা এগিয়ে।

■ বঙ্গবন্ধুকে প্রেরণায় নিয়ে বিশ্ব :

বঙ্গবন্ধু আজ শুধু আমাদের প্রেরণায় নয়, রয়েছে বিশ্ব প্রেরণায়। বিশ্ব নেতা কেনেথা কাউন্ডা বলেন “বঙ্গবন্ধু ভিয়েতনামী জনগণকে অনুপ্রাণিত করে”।

অর্থাৎ বাঙালির বন্ধু যেন আজ বিশ্বের বন্ধু। বিশ্ববাসী আজ তাদের উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বঙ্গবন্ধুকে বেছে নিয়েছে তাদের প্রেরণা হিসেবে।

■ উপসংহার :

বঙ্গবন্ধু যাঁর একটি তর্জনীর হুংকার হলো একটি জাতির স্বাধীনতা। দেশপ্রেমের চেতনায় মাতাল যে কোন জাতি যদি প্রেরণা হিসেবে নেয় বঙ্গবন্ধুকে তবে অতি সহজেই বয়ে আসবে নব উত্থান। বাঙালি যেন তাই করেছে। দেশপ্রেমের চেতনায় ১৯৭১ সালে ৩০ লক্ষ সূর্য সন্তানকে হারিয়ে বঙ্গবন্ধুকে প্রেরণায় নিয়ে বাঙালি শুরু করে পথচলা। একের পর এক আবিষ্কার, উদ্যোগ ও সফলতার বাস্তবরূপ দিয়ে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। তাই আজও বিশ্ব অগ্রযাত্রায় শামিল হতে হলে আমাদের প্রেরণা হবে বঙ্গবন্ধু এবং দেশপ্রেমের চেতনায় হতে হবে বলীয়ান।

সাব্বির আহমেদ দিগন্ত
১০ম শ্রেণি
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল
মডেল কলেজ
ঢাকা।

"দেশপ্রেমের চেতনা, বঙ্গবন্ধু আমার প্রেরণা"

* ভূমিকা
* দেশপ্রেমের স্বরূপ, চেতনা ও দৃষ্টান্ত
* বঙ্গবন্ধুর প্রেরণায় দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি
* দেশপ্রেম ও রাজনীতি
* দেশপ্রেমের উজ্জ্বল নিদর্শণ
* বঙ্গবন্ধু ও দেশপ্রেম
* উপসংহার।

ভূমিকা :

নিজের দেশকে ভালোবাসে না এমন কে আছে? নিজের দেশকে, দেশের মানুষকে ভালোবাসাই হচ্ছে দেশপ্রেম। আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য শিশুকাল হতেই ভালোবাসা দেখিয়েছেন। তিনি দেশপ্রেমের এক জ্বলন্ত উদাহরণ। এই প্রেমেই তিনি স্বদেশের প্রতি গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধাকে আবেগ-নিটোল করেন। কবির কণ্ঠে দেশপ্রেম-

"ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা"

দেশপ্রেমের স্বরূপ, চেতনা ও দৃষ্টান্ত :

দেশপ্রেম মানুষের স্বভাবজাত গুণ। বস্তুত মা, মাটি ও মানুষকে ভালোবাসার মধ্যেই দেশপ্রেমের মূল সত্য নিহিত। একটি ব্যক্তি শিশুকাল হতেই স্বদেশের মাটি, পানি, বায়ু, আকাশ থেকে সে মায়ের আদলে পুষ্ট হতে থাকে। তাই সে দেশের ভাষা-সাহিত্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য সমাজ, সংস্কৃতি এবং জীবন পরিবেশকে ভালোবাসতে শুরু করে। এই ভালোবাসাই হচ্ছে দেশপ্রেম। শুধু মুখে মুখে এই ভালোবাসার কথা বললেই দেশপ্রেম হয় না। চিন্তায়, কথায়, কাজের দশের জন্য যে ভালোবাসা প্রকাশ পায়, সেটাই প্রকৃত দেশপ্রেম। বিশেষভাবে বলতে গেলে স্বদেশপ্রেম যেসব দ্বারা উজ্জ্বল সেগুলো হলো-আত্মত্যাগ, বীরত্ব, সরলতা, কৃতজ্ঞতা, দায়িত্ব এবং কর্তব্য। বঙ্গবন্ধু এ সকল গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর দেশপ্রেম ছিল প্রকৃত দেশপ্রেম। এডউইন আর্নল্ড বলেছেন- জীবনকে ভালোবাসি সত্য, তবে দেশের চেয়ে বেশী নয়। স্বাধীনতা, সংগ্রাম ও জাতীয়তাবোধ হলো স্বদেশপ্রেমের প্রধান উৎসব। অতীতে বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাস তো স্বদেশ প্রীতির জ্বলন্ত স্বাক্ষর।

বঙ্গবন্ধুর প্রেরণায় দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি :

আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ছিলেন দেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি শৈশব থেকেই বাংলা ও বাংলার মানুষকে মনেপ্রাণে ভালোবেসে ছিলেন। তিনি সর্বদা এদেশের মানুষের কথা ভেবেছেন। মানুষের মুক্তির ডাক দিয়েছেন। তিনি দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য রাস্তায় নেমেছেন। তিনি অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে হাত উঠিয়েছেন। তাঁর দেশপ্রেমের অভিব্যক্তিই ছিল স্বাধীনতার ডাক। এই ডাকে জনগণ একজোট হয়ে দেশকে স্বাধীন করে। বঙ্গবন্ধুর অতুলনীয় দেশপ্রেমের জন্যই আমরা বিজয়ী হয়েছিলাম। তাই বর্তমান তরুণ প্রজন্মের কর্তব্য বঙ্গবন্ধুর প্রেরণায় দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলা।

দেশ প্রেমের উজ্জ্বল নির্দশন :

আমাদের দেশে অনেক মানুষ দেশপ্রেমের উজ্জ্বল উদাহরণ সৃষ্টি করে বরনীয় হয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, এ কে ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানীসহ প্রমুখ চিরদিন আমাদের প্রেরণা হয়ে থাকবেন। তারা দেশপ্রেমকে এক অন্য মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করে দেশের মাঝে শান্তি ফিরিয়ে দিয়ে ছিলেন। এমন বহু মানুষ দেশপ্রেমের জ্বলন্ত নিদর্শন। দেশের প্রেমে ৭ জন বীর মাতৃভাষা রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। তাছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে বহু মানুষের দেশপ্রেমের ফলেই আমরা স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছিলাম।

বঙ্গবন্ধু ও দেশপ্রেম :

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন এদেশের মানুষের মুক্তির জন্য, অধিকারের জন্য। ১৯৭১ সালে তিনি স্বাধীনতার ডাক দিয়ে এদেশের মানুষকে মুক্ত করেছিলেন। যা দেশপ্রেমের জন্যই সফল হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে বাংলার মানুষের দেশপ্রেম বিশ্বকে তাক লাগিয়েছিল। যার কেন্দ্রে ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাক। তিনি যে অবদান রেখেছেন তা কখনো ভোলা যায় না। ছোটবেলা থেকেই তিনি অন্যের দু:খে নিজে দু:খ পেতেন। তিনি কখনো কষ্ট দেখতে পারতেন না। তিনি সবসময় বাংলা ও বাংলার মানুষের কথা ভেবেছেন, যা প্রকৃত দেশপ্রেম। দেশের মানুষের জন্য তিনি অন্য দেশে সাহায্য চেয়েছেন। তাঁর অর্থ-সম্পদ বিলিয়ে দিতেন শুধুমাত্র বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে। এদেশের মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন এবং এদেশকে মুক্ত করেছেন। আমাদের উচিত বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেমকে আদর্শ করে নিজেদের স্বদেশপ্রেম গড়ে তোলা।

উপসংহার :

দেশপ্রেম মানব জীবনে অন্যতম মহৎ চেতনা। তা মানুষকে স্বার্থপরতা, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতা ইত্যাদি ভেদাভেদ থেকে উর্ধ্বে উঠতে সহায়তা করে। একুশ শতকের বিশ্ব সভায় মাথা তুলে দাড়ানোর জন্য আজ দরকার দেশ গঠনের কাজে সকলকে উদ্বুদ্ধ ও সমবেত করার। এজন্য চাই ঐক্যবদ্ধ দেশব্রতী জাতীয় জাগরণ। তাই বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেমকে আদর্শ করে আমাদের দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে তুলতে হবে, যাতে দেশ গঠনে আমরা শুভ চিন্তা ও ত্যাগের আদর্শ স্থাপন করতে পারি।

মোঃ মাহিন রানা
১০ম শ্রেণি
আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন
স্কুল ও কলেজ
বগুড়া।

"মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়ায়,
বাংলাদেশ পৌঁছাবে অনন্য উচ্চতায়"

■ অবতরণিকা :

বাংলাদেশের মানুষের জাতীয় জীবনে এবং এদেশের সামগ্রিক অগ্রগতিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা একটি বলিষ্ঠ চেতনা, আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ় উচ্চারণ। মুক্তি, গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা, বৈষম্যবিলোপ ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করে একটি উন্নত রাষ্ট্র গঠনে এবং বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের নাম সমুন্নত করতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অপরিহার্য। অন্যদিকে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনস্বীকার্য। তাই বাংলাদেশ অনন্য উচ্চতায় পৌঁছাতে উভয়ের গুরুত্ব অনেক।

■ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সুরুত্ব :

অনেক রক্ত আর অসংখ্য জীবনের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা। যেসব কারণে বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, সেগুলোকেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলা যায়। নিজের ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা, অন্যায়-অত্যাচার শোষণ বঞ্চনার অবসান, অসাম্প্রদায়িকতা প্রতিষ্ঠা। সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং স্বকীয়তা রক্ষাই মূলত মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম চেতনা। বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ট নেতৃত্ব ও জনগণের সুমহান আত্মত্যাগ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আমাদের এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণা, পাথেয়।

■ অনন্য উচ্চতা আহরণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অবদান :

মুক্তিযুদ্ধ যেমন আমাদের স্বকীয়তা দিয়েছে, তেমনি বিশ্ব মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে স্বাধীন জাতি হিসেবে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশ বর্তমানে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। আর *Price Waterhouse Coopers* এর প্রক্ষেপণ মতে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৮ তম বৃহৎ অর্থনীতিসমৃদ্ধ রাষ্ট্র এবং এসব অগ্রগতির পেছনে প্রত্যক্ষভাবে অবদান রেখেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষার হার ৬৩.৬%, মাথাপিছু আয় ১৯১৯ ডলার, (প্রায়), জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.২৮%, দারিদ্রের হার ২৩.৫% এবং বাংলাদেশ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পাট উৎপাদনকারী দেশ। মানবসম্পদ উন্নয়ন, উৎপাদনশীল নাগরিক গঠন, বৈষম্য দুরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশুমৃত্যু হ্রাসসহ আরো অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশ হতে বহুলাংশে এগিয়ে। আর এসব উন্নয়নের চেতনামূলে যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় কাজ করেছে তা অনস্বীকার্য। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ থেকে ক্রমেই বাংলাদেশ অনন্য উচ্চতা আরোহনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেই উচ্চতায় ইতোমধ্যে আরোহন করেছে। তাইতো কবি বলেন-

"সাবাস বাংলাদেশ
এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়,
জ্বলে পুড়ে-মরে ছারখার
তবুও মাথা নোয়াবার নয়।"
-সুকান্ত ভট্টাচার্য

মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ট নেতৃত্ব, শহীদদের সুমহান আত্মত্যাগ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যা আমাদের জাতীয় অগ্রগতির চেতনামূল কাজ করছে। তাই এর অবদান অপরিসীম।

■ অনন্য উচ্চতায় আরোহনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান :

সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলে প্রযুক্তি নির্ভর উৎকৃষ্টতার দিকে ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আর একটি দেশের অগ্রগতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান সর্বাধিক। বর্তমানে শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, যোগাযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমাদের দেশ অনন্য উচ্চতায় পৌঁছার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিজ্ঞান প্রযুক্তিগত দিকে যে আমরা ক্রমেই অনন্য উচ্চতার দিকে ধাবিত হচ্ছি তার প্রকৃষ্ট দিক হলো *Bangabandhu Satellite-1 (BS-1)* এটি নিক্ষেপের মাধ্যমে আমরা নিজস্ব স্যাটেলাইটধারী ৫৭ তম দেশ হিসেবে বিশ্বের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি। এছাড়াও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে আমাদের অনন্য উচ্চতায় আরোহনের আর একটি উদাহরণ।

পাশাপাশি *E-Governnace , E-Service, Outsourcing, Freelancing Hi-Tech Park, 4G, 5G, Tele-medicine, Data Centre, Nano Technology* ইত্যাদির ব্যবহার আমাদের অগ্রগতির সামগ্রিক চিত্রকেই নির্দেশ করে। তথ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর প্রতিষ্ঠা এ গতিকে আরো ত্বরান্বিত করেছে। *WITSA* এর সূত্রানুযায়ী, তথ্য প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সামগ্রিক অবস্থার উন্নয়নের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান ২৩। তাই অনন্য উচ্চতায় আরোহনে বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান অপরিসীম। এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়াতেই আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

◆ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ছোঁয়ায় সাম্প্রতিক উন্নয়নের পরিসংখ্যান :

◆ GDP Groath Projection 2019

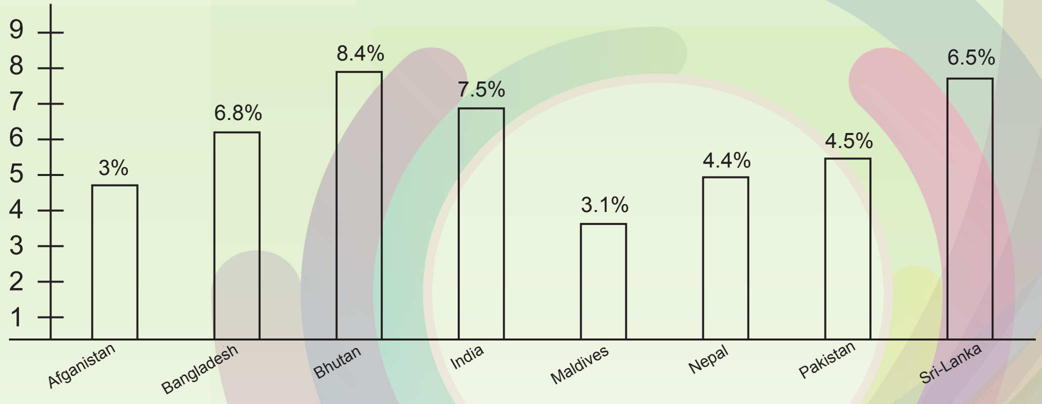

Source : IME

◆ GNP এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ধারাবাহিক অগ্রগতি

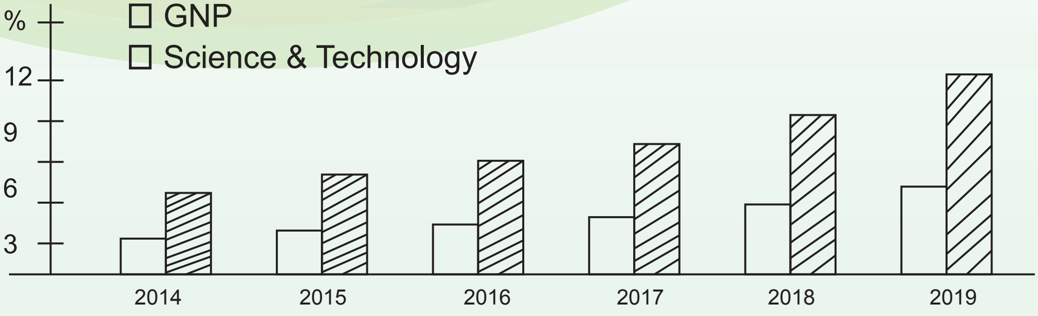

তথ্যসূত্র :- ADB WITSA

বাংলাদেশের অনন্য উচ্চতায় পৌঁছানোর কতিপয় মাইলফলক

মাইল ফলক	সাল	মাইল ফলক	সাল
Bangabndhu Satellite-1	১২মে, ২০১৮	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	১৯৬৫
পদ্মা সেতু	২০১৪ (শুরু)	সাবমেরিন ক্যাবল	২০০৬
রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	২০১৩ (শুরু)	বায়োমেট্রিক (SIM)	২০১৫
4G	২০১৮	ই-সেবা (ইলেট্রনিক সেবা)	২০১০

তথ্যসূত্র : Internet

এসব অগ্রগতির চেতনামূলেই ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়া।

বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় নিতে আমাদের করণীয় :

- মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বুকে ধারণ করতে হবে ;
- স্বদেশকে সর্বাধিক ভালোবাসতে হবে ;
- দেশের উন্নয়নে কাজ করতে হবে ;
- সর্বস্তরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার ঘটাতে হবে ;
- দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকে প্রাধান্য দিতে হবে
- ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

উপসংহার :

স্বাধীনতা পরবর্তী এই স্বল্প সময়ে বাংলাদেশের অর্জন কম নয়। গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা, নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, মানব সম্পদ গঠন, দুর্নীতি অবসান ইত্যাদি নিশ্চিতের মাধ্যমে বাংলাদেশ ক্রমেই অনন্য উচ্চতার দিকে দুর্বার গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। এক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বিজ্ঞান প্রযুক্তি আনয়ন করছে নতুন গতি। তাইতো মনে বেজে উঠে ঃ

"একাত্তরে করেছিলাম মুক্তিযুদ্ধ
আজও রয়েছে চেতনা...
মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনা
আমরা কখনো ভুলব না।

আমার দেশের সুনাম ছড়িয়েছে
একের পর এক উন্নয়নে
মহাকাশেও নাম ছড়িয়েছে
বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উড্ডয়নে।

নিজ অর্থায়নে পদ্মাসেতু
করেছি মোরা সম্ভব...
সারাবিশ্ব বলেছিল
পদ্মাসেতু অসম্ভব।"

তাই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে তথা বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছাতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

সাদমান সামি
১০ম শ্রেণি
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল
মডেল কলেজ
ঢাকা।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বাংলাদেশ পৌঁছাবে অনন্য উচ্চতায়

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি।
-গোবিন্দ হালদার।

বাঙালির জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা একটি বলিষ্ঠ অনুভূতি এবং আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ় অঙ্গীকার। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী বলেছেন, আলোক ব্যতিত যেমন পৃথিবী জাগে না, স্রোত ব্যতীত নদী টিকে না, তেমনি স্বাধীনতা ব্যতীত জাতি কখনো বাঁচতে পারে না" বাংলাদেশের মানুষও নদীর স্রোতের মতো চিরন্তন সত্যের পথ ধরে ১৯৭১ সালে ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীনতার কাঙ্ক্ষিত সূর্যকে। ত্রিশ লাখ প্রাণের বিনিময়ে এদেশবাসী যে স্বাধীনতা এনেছে তাকে চির সমুন্নত রাখতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আবহমান কাল ধরে প্রেরণা জোগাবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাঙালি ও বাংলাদেশ পৌঁছে যাবে উন্নতির চরম শিখরে।

পাকিস্তানী শাসনামলে দীর্ঘ শোষণের ফলে স্বৈরাচারি শাসকদের কবল থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সকল শ্রেণির মানুষের আদর্শ ও নতুন দিনের পথপ্রদর্শক হিসেবে ১৯৭১ সালে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ যার চেতনা মিশে আছে আমাদের জীবনে, সাহিত্যে, সংগীতে, শিল্পকলায়, সংস্কৃতিতে। বহু আত্মত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার মাধ্যমে সফলতা পেয়েছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। বঙ্গবন্ধুসহ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া প্রত্যেকেই এমন একটি বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন যে বাংলাদেশ জ্ঞান প্রযুক্তি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বলিষ্ট হয়ে নিজেকে নিয়ে যাবে অনন্য উচ্চতায়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জয়রথ আজ বিশ্বব্যাপী এতদূর এগিয়েছে যে শুধু শিল্প বাণিজ্য নয়, জীবনযাত্রায় ঘটেছে ব্যাপক পরিবর্তন। আধুনিক জীবন আজ প্রযুক্তির সাথে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেছেন- যন্ত্র বিজ্ঞানের উন্নতি এতদূর এগিয়েছে যে, আজ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলো মানুষকে ভাবনার দায় থেকে রেহাই দিয়েছে। যন্ত্রের হাতে নির্ভাবনায় নিজেকে সঁপে দেওয়া ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে অকুতোভয়ে অজানা সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ায় হলো আজকের দিনের নির্দেশ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বপ্ন দেখে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রধান হাতিয়ারই হচ্ছে জ্ঞান-প্রযুক্তি। বাংলাদেশ প্রযুক্তির হাত ধরে অনেকদূরে এগিয়ে গিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও যাবে। বর্তমানে বাংলাদেশে আইসিটি খাতের আয় ১০০ কোটি ডলার যা ২০২১ এ ৫০০ কোটি ডলার হবে বলে আশা করা হচ্ছে। মহাকাশে বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট বাংলাদেশকে নিয়ে গিয়েছে অনন্য উচ্চতায়। দেশে ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণার সঙ্গে মানুষের জীবনেও এর বড় প্রভাব দেখা গেছে, বড় পরিবর্তন এসেছে। উবার-পাঠাওয়ের মতো রাইড শেয়ারিং সেবায় স্মার্টফোন ব্যবহারকারী যুক্ত হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে নতুন উদ্যোক্তা। বিজ্ঞান প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতির কারণে দেশে প্রথম কৃত্রিম স্যাটেলাইট, মেইড ইন বাংলাদেশ। ৪জি, ৫জি নিজস্ব ডেটা সেন্টার, হাইটেক পার্ক, মানব সম্পদ উন্নয়ন, তথ্য ডিজিটালাইজেশন, স্টার্টআপ কালচার, ই-গভর্ন্যান্স, ফেসবুকিং ও ফ্রিল্যান্সিং ইত্যাদি শব্দগুলো আজ আমাদের অতি পরিচিত। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে বর্তমানে বিশ্ব একটি 'গ্লোবাল ভিলেজ' এ পরিণত হওয়ায় আজ প্রযুক্তি ছাড়া একমুহূর্তও বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এজন্য আধুনিক যুগ হলো তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। তাই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে বিজ্ঞান প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বাংলাদেশকে পৌঁছাতে হবে অনন্য উচ্চতায়।

"ডিজিটাল বাংলাদেশ তুমি ধুয়ে মুছে সাফ করে দাও আমাদের চলার পথটা, বড্ড বেশী কাঁদা জমেছে, সোজা হয়ে দাড়াতে পারছি না, ছুটে চলা দূরে থাক। অথচ আমাদের পার করতে হবে যোজন পথ। পৌঁছাতে হবে বিজয় লক্ষ্যে। স্পর্শ করতে হবে বিজয়স্তম্ভ।"
-এমাজ উদ্দিন আহমদ
নতুন এক পৃথিবীর সূচনালগ্নে এমন প্রত্যাশা সকল বাঙালির। ডিজিটাল বাংলাদেশ একটি প্রত্যয়। কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে বাংলাদেশে পরিণত হচ্ছে জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ। যে জাতি ভাষার জন্য রক্ত দিতে পারে, রাজপথ রঞ্জিত করতে পারে সে জাতির জন্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ছোঁয়ায় নিজেকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা অসম্ভব হতে পারে না।

মোঃ সাইফুল ইসলাম
১০ম শ্রেণি
বিওএফ হাই স্কুল
বিআইডিসি ডুয়েট
গাজীপুর।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বাংলাদেশ পৌঁছাবে অনন্য উচ্চতায়

ভূমিকা :

"সাবাস বাংলাদেশ! এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয়;
জ্বলে-পুড়ে মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।"

বাংলাদেশ চির সবুজের দেশ। যার মধ্যে রয়েছে হাজারো নদ-নদী, শত শত পাহাড় এবং অজস্র ধান ক্ষেতের সমন্বয়। ছয়টি ঋতুর ভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্য এদেশকে আরো বৈচিত্র্যময় করেছে। বাঙালির আরো একটি পরিচয় আছে। তা হলো বাঙালি বীরের জাতি। এ বীরত্বের অহমিকায় মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করে বাঙালির স্বপ্ন এখন বিজ্ঞানের ছোঁয়ায় অনন্য উচ্চতায় পৌঁছানো।

মুক্তিযুদ্ধ :

হাঁটি হাঁটি পা পা করে বাংলাদেশ আজকে বিজয়ের ৪৯ তম বছর পার করছে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বর্বর পাকিস্তানিদের কাছ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বাঙালি জাতি হারিয়েছিল ৩০ লক্ষ সূর্য সন্তান এবং ৩ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম। এত ত্যাগের পরেও বাঙালির হার না মানার পিছনে যে কারণটি প্রধান তা হলো বাঙালির ছিল একজন বঙ্গবন্ধু। কিউবার মহান বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো বলেন, *Never see Himalayan, but I see Bangabondhu* মুক্তিযুদ্ধের পর তাঁরই দৃঢ় নেতৃত্বে শুরু হয় বাঙালির উন্নয়নের অগ্রযাত্রা।

বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা :

বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের পর প্রথম চেতনাই ছিল বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বাহবা নিয়ে অনন্য পর্যায়ে পৌঁছানো। আর এ চেতনাকে বুকের কষ্টিপাথরে খোদাই করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়ায় উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

■ **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বাংলাদেশের সাফল্য :**

আমাদের উপর অনেক আগে থেকেই বিজ্ঞানের ছোঁয়া লাগতে শুরু করেছে। আকাশ ছুঁতে যখন স্বপ্ন উকি দেয় বাঙালির, তখনই বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসেবে ২০১৮ সালের ১২ মে মহাকাশে প্রেরণ করে "বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাই-১" ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে দেশ এগিয়ে যায় আরও এক ধাপ। উন্নত রাষ্ট্রসমূহের সাথে পাল্লা দিয়ে বাঙালি দৃশ্যমান করে পাবনার "রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র" এ যেন বাঙালির আকাশ ছোঁয়া সাফল্য। এছাড়াও "কর্ণফুলি টানেল" তৈরী করা ও বাঙালির এক মহা সাফল্য। অর্থাৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির রঙে রঙ্গিন বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে বাধাহীনভাবে।

■ **এসডিজি লক্ষ্য পূরণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব :**

অর্থনৈতিক সামাজিকসহ নানা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের লক্ষ্য এখন এসডিজি। আর এ এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি রয়েছে প্রধান ভূমিকায়। অদক্ষ বাঙালিকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে বিলোপ করছে দারিদ্র্য। ঘরে বসে আমরা এখন করছি আউটসোর্সিং। এছাড়াও বিজ্ঞানের কল্যাণকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ এখন জলবায়ু পরিবর্তন রুখতেও সক্ষম। আর এভাবেই এ এসডিজি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ পৌঁছে যাবে এক অনন্য উচ্চতায়।

■ **তরুণদের উপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব :**

আমাদের সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞান প্রভাব রাখলেও এর অতি ব্যাপক প্রভাব পড়ছে তরুণদের উপর। বিজ্ঞানে তরুণরা কতটা অগ্রসর তা তাদের সাফল্যেই প্রতিফলিত হয়। ২০১৮ সালে গ্রিসে অনুষ্ঠিত এক গণিত অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের তরুন শিক্ষার্থী জাওয়াদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রথম হয়। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী তাদের দক্ষতার ফলে নাসায় কাজ করার সুযোগ লাভ করে। তরুণ, যারা দেশের আগামীর নেতৃত্বদানকারী তারা বিজ্ঞানের ছোঁয়ায় বিশ্বকে উপহার দিচ্ছে নানান আবিষ্কার।

■ **বাংলাদেশ অনন্য উচ্চতায় পৌঁছাতে বাঙালিদের অবদান :**

বিশ্বায়নের এ যুগে বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলছে বাঙালিরা। যা বাংলাদেশ এনে দেয় সম্মান ও মর্যাদা। তরুন ডাক্তার ডা: শুভ রায় শরীরের ভিতরে প্রতিস্থাপন যোগ্য কিডনী আবিষ্কার করে বাংলাদেশের নাম উঁচু করেন বিশ্বের কাছে। জাঁদরেল গবেষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত পদার্থ বিজ্ঞান ড. জাহিদ হাসান। বর্তমান থেকে শতগুণ বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন কম্পিউটার জন্য "ক্যাগোস কোয়ান্টাম চুম্বক" আবিষ্কার করে বিজ্ঞানের জগতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেন। এছাড়াও কঠিন বস্তুর মধ্যে ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যা বের করার কৌশল আবিষ্কারের মাধ্যমে তিনি বিশ্বকে আরেকবার বাঙালিদের কথা মনে করিয়ে দেন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ "জামাল নজরুল ইসলাম" এর লেখা একটি বই "অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়" এর পাঠ্যসূচিতে অর্ন্তভুক্ত করা হয়। এভাবেই একের পর এক আবিষ্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে বিশ্বের অন্যতম দেশে পরিণত হচ্ছে।

■ **উপসংহার :**

১৯৭৯ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জাতি তার ৩০ লক্ষ সন্তানদের হারিয়ে এক চেতনা নিয়ে শুরু করে পথচলা। সেই পথচলা এখনো অব্যাহত। একের পর এক আবিষ্কার উদ্যোগ ও সফল বাস্তবতার রূপ দেয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ এখন অনুন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে। আর এতে একটি সার্থক সঙ্গ দিয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এ ছোঁয়ায় বাংলাদেশকে উন্নয়নের অনন্য উচ্চতায় পৌঁছাতে আজও সকল বাঙালি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অতএব, এভাবে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়ায় এগোতে থাকলে একদিন পৌঁছে যাবে বিশ্বের অনন্য উচ্চতায়।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

বিজ্ঞান জাদুঘরের নতুন আকর্ষণ

যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি অত্যাধুনিক টেলিস্কোপ
ও
আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ মিউজিয়াম বাস

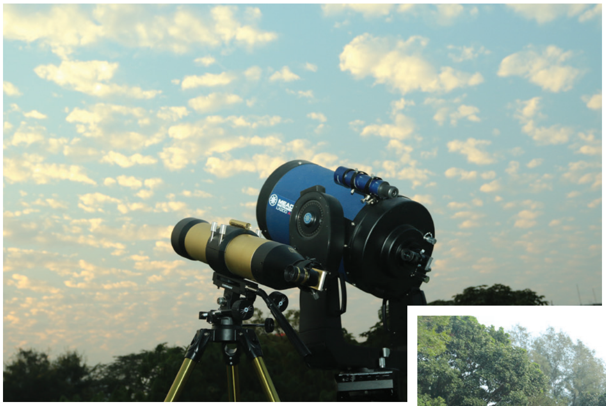

ভ্রাম্যমাণ মিউজিয়াম বাস, ৪ডি মুভিবাস ও টেলিস্কোপ প্রদর্শনীর জন্য নিম্নোক্ত নম্বরে যোগাযোগ করুন-

https://www.facebook.com/nmstbdpg/

www.nmst.gov.bd

০১৭২২-১২৬২৩১, ০১৯৮৬-২৫৪৯৯১
০১৩০৯-৩১৩০৬১